কাজী আনোয়ার হোসেন
প্রমাণ কই?
মাসুদ রানা

# প্রমাণ কই?

**প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৭২**

## এক

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ নেই। শূন্য পড়ে আছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারটা। চীফ নেই, মাসুদ রানা নেই, অথচ তিন মাসের মধ্যেই সুষ্ঠু ভাবে চলতে শুরু করেছে আবার সমস্ত কাজকর্ম। অগাধ পানিতে পড়েছিল সোহেল। মস্ত বোঝা চেপে গিয়েছিল ওর মাথার উপর। প্রথম একটা মাস দুশ্চিন্তা জর্জরিত সোহেলের বিমর্ষ চেহারা দেখলে রীতিমত মায়া হত সোহানার। মনে হত, কয়েক বছর বেড়ে গেছে বেচারার বয়স। কিন্তু হঠাৎ কি করে যেন আবার আগের মত হাসিখুশি হয়ে উঠেছে মানুষটা। সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হিসেবে। হয় হঠাৎ নিজের মধ্যে প্রচণ্ড কোন শক্তি খুঁজে পেয়েছে সে, যার ফলে যোগ অঙ্কের মত সহজ হয়ে গেছে ওর কাছে সমস্ত কাজ; নয়তো অন্য কারও দক্ষ হাতে গুরু দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেঁচেছে সে। অন্য আর কোন লোক দেখা যাচ্ছে না, কাজেই ধরে নেয়া যায় হঠাৎ রাতারাতি আত্মবিশ্বাস, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতা দশগুণ বেড়ে গেছে সোহেলের।

এটা যে একেবারে অসম্ভব, তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে কোন দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূল চাপের সম্মুখীন হলে মানুষ হঠাৎ নিজের মধ্যে প্রচণ্ড কোন ক্ষমতার উৎস আবিষ্কার করে বসে। এটা সম্ভব। কিন্তু কেমন যেন একটু সন্দেহ জাগে মাঝে মাঝে সোহানার মনে। সোহেলই যদি সবকিছু চালাবে তাহলে চীফের গদিতে বসছে না কেন সে? কেন শূন্য পড়ে রয়েছে সাততলার সেই কামরাটা, যার দরজার সামনে দাঁড়ালে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় আপনা আপনি নত হয়ে আসত প্রতিটা দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী এজেন্টের মাথা? কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে টেলিফোনে কার সাথে কথা বলে সোহেল দরজা বন্ধ করে? চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটারের চেয়ারের পাশে ছোট্ট টিপয়ের উপর রাখা লাল টেলিফোনটা বাজলেই ঘর থেকে সবাইকে বের করে দেয় কেন সে? কিছু একটা গোলমাল আছে। অদৃশ্য কারও ছায়া যেন আঁচ করতে পারছে সোহানা। কে সে? মেজর জেনারেল রাহাত খান? রানা?

একটা ফটোগ্রাফী ইয়ার বুক ঘাঁটছিল সোহানা। আর ভাবছিল।

নাহ্, রানা কি করে হবে? গত দু'মাসে দু'বার মাত্র দেখা পেয়েছে সে রানার। অত্যন্ত ব্যস্ত সে! বাড়িতে পাওয়া যায় না, মতিঝিলে অফিস নিয়েছে একটা, সেখানে

থাকে না—কোথায় থাকে, কোথায় যায়, কি করে কেউ জানে না। মাঝে নাকি ঢাকার বাইরেও ছিল বেশ কিছুদিন। মনে হচ্ছে কত যুগ যেন দেখেনি সে রানাকে। ওকে দেখার জন্যে মনটা কেমন যেন করে ওর। ওকি প্রেমে পড়েছে? দূর, ওই লোকের প্রেমে পড়া যায় নাকি? আকর্ষণ বোধ করে ও, ব্যস এই পর্যন্তই। ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল লোকটা, বাইরেই রয়ে গেল। বাঁধনে পড়ে না বলেই কি ওর এত আকর্ষণ?

আজ অফ ডে। নায়লাকে নিয়ে তিনটার শোতে সিনেমায় যাবে ঠিক করেছে। সাজগোজ সেরে ছবির পাতা উল্টাচ্ছে এখন। টিকেট কেটে রেখেছে নায়লা ওর ভাইকে দিয়ে সকালেই পৌনে তিনটা বাজলেই রওনা হবে সোহানা, নায়লাকে তুলে নিয়ে চলে যাবে অভিসারে। ঠিক দুটো চল্লিশে ফোন বেজে উঠল। সুরেলা মেয়েলী কণ্ঠস্বর। মাসুদ রানা কথা বলতে চান।

'দিন ওকে।' হঠাৎ কেন যেন বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব শুরু হয়ে গেল সোহানার। বহুদিন অপেক্ষার পর এসেছে রানার ফোন। গোলাপী একটা আভা ছড়িয়ে পড়ল গালে। গরম হয়ে উঠেছে কান দুটো। নিজেকে শাসন করল সোহানা—এই, কি হচ্ছে! নিজের এই পরিবর্তনে আয়নার দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করল সে নিজেকে।

খুটখাট শব্দ, বাযারের অস্পষ্ট আওয়াজ খটাং, তারপর ভেসে এল রানার ভরাট কণ্ঠস্বর।

'কি করছ, সোহানা?'

'তোমার মুণ্ডুপাত করছি। মেয়েটা কে?'

'আমার নতুন অফিসের সেক্রেটারি।'

'নাম?'

'সালমা কবীর

'বয়স?'

'বাইশ।'

'গায়ের রঙ?'

'ফর্সা।'

'চেহারা?'

'অপূর্ব।'

'অবিবাহিতা?'

'হ্যাঁ।'

'দাঁড়াও! তোমার চোদ্দটা বাজাচ্ছি আমি!'

হো হো করে হাসল রানা। তারপর বলল, 'তোমার সব কথা শুনতে পাচ্ছে সালমা।'

'ছি ছি, আল্লা! তাই নাকি? সত্যি?'

'সত্যি না তো কি?'

'কসম লাগে তোমার, সত্যি, শুনতে পাচ্ছ?' সোহানার কণ্ঠে অনুনয়।

'না। ঠাট্টা করছিলাম। কি করছ এখন? পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড় পরে চলে আসতে পারবে?'

ধক করে উঠল সোহানার বুকের ভিতরটা। রানা ডাকলে কেন যে এরকম হয় বুঝতে পারে না সে। মনে হয়, এক্ষুণি ছুটে চলে যাই। সামলে নিয়ে তরল কণ্ঠে বলল সে, 'কেন? এত তাড়া কিসের? একেবারে পাঁচ মিনিটে...'

'তিনটের শোতে সিনেমা দেখব। ভাবছি তোমাকে নেব, না সালমাকে...'

'খবরদার! ও যদি তোমার সাথে যায় তাহলে ঠ্যাং ভেঙে দেব আমি ও মেয়ের। আমি আসছি।'

'জলদি এসো।'

'কোন্ হলে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'কোন্ হলে ছবি দেখবে?'

'অভিসার।'

এই সেরেছে! 'দূর, বাজে বই চলছে ওখানে। অন্য কোন হলে চলো।'

'টিকেট কাটতে পাঠিয়ে দিয়েছি গিলটি মিঞাকে। বাজে বই মানে? তিন তিনটে অস্কার পেয়েছে...'

'দশটা অস্কার পেলেই বা কি? ওই হলে সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না। যাক, আসছি আমি, তারপর দেখা যাবে কোথায় যাওয়া যায়।'

'পৌনে তিনটে বাজে, তাড়াতাড়ি এসো। আমি অফিসে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

'ঠিক আছে। মেয়েটাকেও সেই ফাঁকে এক নজর দেখে নেয়া যাবে। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, সিনেমা কেন হঠাৎ?'

'হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল, তাই।'

'এতদিন মনটা কোথায় পড়ে ছিল?'

'কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

'হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল কেন?'

'শাট্ আপ! বাজে না বকে কাপড়-চোপড় পরে নাও।'

'কাপড় পরাই আছে, স্যার। আসছি।'

লাইন কেটে দিয়েই দ্রুত রিং করল সোহানা নায়লার নাম্বারে। সেই পুরানো গৎ—রাগ করিস না ভাই, আমার না, ভীষ...ণ মাথা ধরেছে।...সত্যি...না না, আর কিছু না, কেউ ফোন করেনি।...তুই তোর সেই মামাত ভাইটাকে নিয়ে যা না? ...ইশ্শ্, আমি যেন কিছু জানি না!...যাহ্ কি অসভ্য! রাখছি। রাগ করিস না কিন্তু!—ইত্যাদি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোহানা। বার

কয়েক চিরুনি বুলাল চুলে। পাউডারের পাফটা আরেকবার হালকা করে বুলাল মুখে, ঘাড়ে, গলায়। লিপস্টিক গাঢ় করে নিল আরেকটু। রানার প্রিয় সেন্ট শ্যানেল নাম্বার ফাইভ স্প্রে করল আঁচলে। শাড়ির কুঁচি ঠিক আছে কিনা ঘুরে ফিরে আয়নায় ভাল করে দেখে নিয়ে খুশি মনে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে। দীঘল একহারা শরীরে চমৎকার মানিয়েছে কাঞ্জিভরম।

বৈশাখের উত্তপ্ত দুপুর।

কর্মব্যস্ত শহরের প্রাণ চাঞ্চল্য ঝিমিয়ে এসেছে অনেকটা। রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য। প্রখর রৌদ্রের দোর্দণ্ড প্রতাপ এখন রাজধানীর বুকে। এক চিলতে মেঘ নেই আকাশে। কার্নিসের এক চিলতে ছায়ায় বসে ঠোঁট ফাঁক করে হাঁপাচ্ছে কাক। শুকনো গরম বাতাস। রাস্তার পিচ গলে গিয়ে চড় চড় শব্দ উঠেছে গাড়ির চাকায়। তেতে উঠেছে গাড়ির ছাত তিন মিনিটেই।

মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া।

বিশাল এক অট্টালিকার সাততলার উপর রানার এয়ার কন্ডিশনড্ অফিস স্যুইট।

লিফটে চড়ে উঠে এল সোহানা সাততলায়। লম্বা করিডর। বাঁ দিকের সবশেষ দরজায় আঁটা রানার নেমপ্লেট। দরজা ঠেলে পুরু কার্পেট মোড়া ঘরে ঢুকতেই ডোর বেলের মিষ্টি একটা আওয়াজ হলো, টুং-টাং। চোখ তুলে চাইল ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে বসা একটি কর্মব্যস্ত তরুণী। সোহানা বুঝল, সালমা কবীর। মিথ্যে বলেনি রানা। একবাক্যে সুন্দরী বলা যায় একে। মিষ্টি হেসে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। সুরেলা কণ্ঠে বলল, 'আসুন। এইদিকে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন মিস্টার মাসুদ রানা।' ইঙ্গিতে রানার কামরার বন্ধ দরজা দেখাল সালমা। এগিয়ে গিয়ে মেলে ধরল দরজাটা।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেয়েটাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল সোহানা খোলা দরজা দিয়ে।

জুতো সুদ্ধ দুই পা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে সুইভেল চেয়ারে বসে চোখ বুজে সিগারেট টানছে রানা। কি যেন ভাবছে সে গভীর ভাবে। সোহানা ঘরে ঢুকতেই চোখ মেলে চাইল। ঝট্ করে পা নামিয়ে নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড।

'মাই গড! দারুণ লাগছে তোমাকে, সোহানা। দিন দিন আরও সুন্দর হয়ে যাচ্ছ তুমি। মনে হচ্ছে তোমাকে না পেলে বাঁচব না। চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু শাড়িটা...'

আস্তে বন্ধ হয়ে গেল সোহানার পিছনে দরজাটা।

'ছি! আক্কেল বলতে কিছুই নেই তোমার?' কপট রাগে ভুরু কুঁচকাল সোহানা। 'বেহায়া কোথাকার। কি ভাবল মেয়েটা বলো তো?'...বোঝা গেল মনে

মনে খুশি হয়েছে সে প্রশংসায়। এগিয়ে এল সে টেবিলের কাছে।

'কি আবার ভাববে? ভাবল, চমৎকার না কচু। লোকটার রুচি বলতে কিচ্ছু নেই! প্রেমে পড়লে একেবারে অন্ধ হয়ে যায় ব্যাটাছেলেগুলো।'

হাসল সোহানা। 'হয়েছে। আর স্ত্রী-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হবে না। উঠে পড়ো। আর পাঁচ মিনিট আছে।'

'আরে বসো, বসো। হাফ-টাইম পর্যন্ত বিজ্ঞাপন আর ট্রেলার দেখাবে। সাড়ে তিনটায় উঠব।'

'তাহলে এত তাড়া দিচ্ছিলে কেন?' বসে পড়ল সোহানা একটা চেয়ারে।

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারছিলাম না। তর সইছিল না কিছুতেই।'

'বাজে কথা রাখো। আসল ব্যাপারটা কি বলো দেখি?'

'আসলে একটা কাজের ভার দেব তোমাকে।'

'কি কাজ?'

'এক্ষুণি আমার এক বন্ধু আসবে। মাহবুব। যুদ্ধে পরিচয়। খুব নাকি বিপদে পড়েছে। কোর্ট থেকে ফোন করছিল। হাজতে ঢোকার আগে বিশ মিনিটের জন্যে আমার সাথে দেখা করার অনুমতি নিয়েছে। ওর বক্তব্যটা শুনবে তুমি মন দিয়ে, তারপর সমস্যাটার সমাধানের দায়িত্ব নেবে।'

'আর তুমি?'

'আমি থাকব তোমার সাথে। অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে।'

'তার মানে তোমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার। এই তো?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা এমন সময় ঝট্ করে দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল গিলটি মিঞা। হাতে ধরা দুটো সিনেমার টিকেট। মুখটা ফ্যাকাসে। দু'জনেই অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে।

'পুলিস!!' প্রায় ফিসফিস করে বলল গিলটি মিঞা। উত্তেজিত চাপা কণ্ঠস্বর। 'এই দিকেই আসচে স্যার! দু'জন দারোগাও আচে!' দরজাটা একটু ফাঁক করে বাইরের দিকে উঁকি দিয়েই পাথরের মত জমে গেল সে। ঘরে ঢুকছে দু'জন পুলিস ইন্সপেক্টর। 'সব্বোনাশ! ঢুঁকে পড়েচে! এইবারই সেরেচে···নিগ্‌ঘাত মারা পড়েচি···' এদিক ওদিক চাইল সে। লুকোবার জায়গা খুঁজছে।

সালমা এসে ঢুকল। 'দু'জন পুলিস অফিসার আপনার সাথে দেখা করতে চান।'

'নিয়ে এসো।'

রানার মুখের দিকে দুই সেকেন্ড আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল গিলটি মিঞা। তারপর টিকেট দুটো টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়েই একলাফে চলে গেল অ্যাটাচড্ বাথরুমের দরজার সামনে। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল সে বাথরুমের ভিতর। কার্পেটের উপর দিয়ে ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে। দরজার সামনে

একটু ইতস্তত করল, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরে। এক নজরেই চিনতে পারল সোহানা। পত্রিকায় ছবি দেখেছে সে এই লোকের।

'এসো মাহবুব।'

'এগিয়ে এল সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলম। ওর পিছনে একজন প্রৌঢ় পুলিস অফিসার। অত্যন্ত রাগী চেহারা। একজোড়া পাকা গোঁফ মোম দিয়ে পাকিয়ে ছুঁচোল করা। পাকা ভুরুর নিচে চোখ জোড়ায় বাঘের দৃষ্টি।

পরিচয় করিয়ে দিল মাহবুব আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। 'ইনি মিস্টার জালাল শিকদার। রমনা থানার ও. সি.। আমার বস্‌। ইনি মিস্টার মাসুদ রানা। এঁরই সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, স্যার। আর ইনি…' সোহানার দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করল মাহবুব।

'ইনি মিস সোহানা চৌধুরী। আমার সহকারিণী। বসুন দারোগা সাহেব। বসো মাহবুব। তোমার ফোন পেয়ে তো ঘাবড়েই গিয়েছি একেবারে। তারপর? কি খবর, লেটেস্ট?'

'লেটেস্ট হচ্ছে হাজত বাস। আমার ব্যাজ আর রিভলভার কেড়ে নেয়া হয়েছে। আমি এখন অ্যারেস্টেড।'

'ফেঁসে গেছ তাহলে? চার্জটা কি?'

'মার্ডার। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার।'

'আই সী!' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রানার।

'চোখে অন্ধকার দেখছি, মাসুদ ভাই। ছয়দিন পর কোর্টে তারিখ পড়েছে। ছয় দিনের মধ্যে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে যে আমি নির্দোষ। অথচ হাজতে বসে কিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।' হতাশ আর উদ্বেগ ফুটে উঠল মাহবুবের মুখে। 'সাহায্য পাব আপনার?'

'তুমি দোষী?'

'না।'

আধ মিনিট ভাবল রানা চোখ বুজে। তারপর বলল, 'ঘটনাটা খুলে বলো দেখি।'

'আপনি কাগজে দেখেননি ঘটনাটা?'

'না। ঢাকার বাইরে গ্রামে ছিলাম। আজ সকালে এসেছি। কাগজ দেখার সুযোগ হয়নি।'

'সাহায্য পাচ্ছি?' উদগ্রীব মাহবুবের দুই চোখ।

'আগে সবটা ব্যাপার শুনব আমি। তারপর কথা দেব। নাও, শুরু করো।'

# দুই

'রাত দেড়টা। নিউ সার্কুলার রোডে নয় ফ্ল্যাটের একটা তেতলা বাড়ির সামনে কার পার্কের পাশে অন্ধকার একটা ঝোপের মধ্যে বসে আছি। তেরো নম্বর বাড়ি। বাড়িটার পিছন দিকে পাহারা দিচ্ছে সাব ইন্সপেক্টর রুস্তম আলী। একটা টেলিফোন পেয়ে আমাদের পাঠিয়েছিলেন ও.সি. সাহেব। ক'দিন আগে হেমায়েতপুর মেন্টাল হসপিটাল থেকে গারদ ভেঙে পালিয়েছিল একজন ভয়ঙ্কর সাইকোপ্যাথ। খুন করে বেড়াচ্ছে সে এখন ঢাকার বুকে রাতের অন্ধকারে। গভীর রাতে জানলার শিক ভেঙে বা দরজার বলটু খুলে ঢুকে পড়ে সে বাড়ির ভিতর। ঘুমন্ত যুবতী মেয়ে পেলেই আক্রমণ করে। মাথায় হাতুড়ি মেরে খুন করে সে প্রথমে, তারপর মৃতদেহের উপর বলাৎকার করে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে কেটে মুখ চোখ বিকৃত করে দেয়। সে দিন রাত এগারোটার সময় হঠাৎ ফোন এল, ওই বাড়িটার আশেপাশে একজন লোককে ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে একজন মহিলা জানালা দিয়ে। খুবই আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর। ফোন পাওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে পজিশন নিয়েছি আমরা।

'গত মঙ্গলবারের ঘটনা। তিন ঘণ্টা ধরে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে সেদিন ঢাকায়। কাল বৈশাখী। এখানে ওখানে ভাঙা ডাল পালা।

'বসে আছি, আর মশা তাড়াচ্ছি। একটু নড়ে উঠল ঝোপটা। বোতাম টিপলাম টর্চের। কুকুর। ঝুরঝুরে বুড়ো একটা কালো অ্যালসেশিয়ান। অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। যাতে ঘেউ ঘেউ না করে সেজন্যে চুক চুক করে ডাকলাম। এল না। গরর্ আওয়াজ করে মিশে গেল অন্ধকারে। অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। মশাগুলোও একেবারে খেপে গেছে রক্তের স্বাদ পেয়ে। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় কী যেন নড়ে উঠল প্রায়-অন্ধকার গাড়ি বারান্দার কাছে। মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল আমার চোখ কান। ছায়ামত দেখতে পেলাম লম্বা একজন লোক সতর্ক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক চাইছে, এগোতে গিয়ে ইতস্তত করল একটু, আবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এদিক ওদিক। তারপর দ্রুতপায়ে সোজা হাঁটতে শুরু করল আমার দিকে। বাম হাতে বেশ বড় সড় একটা ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। এখনও বিশ গজ দূরে আছে সে আমার থেকে।

'রিভলভারটা বের করে হাতে নিলাম। ওর চাল চলনে অপরাধী ভঙ্গি। পাঁচ বছর পুলিসে চাকরি করছি, এ ব্যাপারে আমার ভুল হওয়ার কথা নয়। নিঃসন্দেহ

হলাম, যখন মাঝপথে থেমে আবার এদিক ওদিক চাইল লোকটা, খুট শব্দ হলেই দৌড় দেবে এমন ভঙ্গিতে। প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা করছে যেন লোকটা।

'দশ গজের মধ্যে আসতেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম এক হাতে টর্চ আরেক হাতে রিভলভার ধরে। আলো জ্বেলে বেশ জোরে বললাম—হল্ট, হ্যান্ডস আপ। মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও। আমি পুলিস ইন্সপেক্টর।'

'থমকে দাঁড়াল লোকটা। কিন্তু সে কেবল এক মুহূর্তের জন্যে। পর মুহূর্তে পাঁই করে ঘুরে দৌড় দিল সে বাঁয়ে।

'আমিও ছুটলাম পিছন পিছন। চিৎকার করেই চলেছি—খবরদার, দাঁড়াও, নইলে গুলি করব। কিন্তু গ্রাহ্যও করল না লোকটা, মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চলল সে ফুল গাছ আর ছোট ছোট ঝাউ ঝোপ ডিঙিয়ে। সামনের পুকুরটার কথা ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ পানি দেখতে পেয়ে থেমে গেল লোকটা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল! আবার বললাম—মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও, নইলে গুলি করব।

'মনে হলো লোকটা আদেশ পালন করতে যাচ্ছে। হাতের ব্যাগটা ফেলে দিল সে মাটিতে। দুইহাত তুলছে সে উপরে। হঠাৎ একটা হাত চলে গেল ওর কোটের পকেটে। ঝট্ করে বেরিয়ে এল একটা পিস্তল।

'গুলি করলাম। দুই পা পিছিয়ে গেল লোকটা, দুই হাত শূন্যে ছুঁড়ল, তারপর ঝপাং করে পড়ে গেল পুকুরের ভিতরে। ছুটে গেলাম পুকুরের ধারে। টর্চের আলোয় দেখলাম উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটা, লাল হয়ে উঠছে আশেপাশের পানি।

'ধুপ ধাপ পায়ের শব্দ পেলাম। প্রাণপণে দৌড়ে আসছে রুস্তম আলী। টর্চের আলো ফেলল আমার মুখের উপর। জিজ্ঞেস করল—কি হলো মাহবুব? কে গুলি করল?

'বললাম—আমি। সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে লোকটাকে টেনে তোলার জন্যে নামলাম আমরা দু'জন। তুললাম। মারা গেছে লোকটা ততক্ষণে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে। কেমন একটু সন্দেহ হলো, পাগলা গারদ থেকে পালানো কয়েদী স্যুট পাবে কোথায়? রুস্তম আলী বলল—চেনা চেনা লাগছে মুখটা। এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলে বলল—পিস্তলটা গেল কোথায়? দেখছি না তো! পুকুরে পড়ল নাকি? বললাম—তুমি পকেট সার্চ করো, আমি ব্যাগটা দেখছি।

'ব্যাগটা খুললাম। হাতুড়ি, ছুরি বা তালা খোলার যন্ত্রপাতি নেই। তার বদলে রয়েছে সিরিঞ্জ, স্টেথিসকোপ, থারমোমিটার, ব্লাডপ্রেশার চেক করার যন্ত্র, আর বিভিন্ন কোম্পানীর স্যাম্প্ল ওষুধের শিশি। ডাক্তারের ব্যাগ।

'লোকটার মানিব্যাগের ভেতর ভিজিটিং কার্ড পাওয়া গেল। তাতে লেখা—ডক্টর রুহুল আমীন, এম. বি. বি. এস. এম. আর. সি. পি. ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"সর্বনাশ! বলল রুস্তম আলী—কপালে দুঃখ আছে তোমার মাহবুব!"

— একটানা কথাগুলো বলে থামল মাহবুব। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে মনে মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে শুনছিল রানা। চোখ মেলল না। অভ্যস্ত হাতে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিল চোখ বুজেই। নড়ে চড়ে বসল সোহানা। আবার শুরু করল মাহবুব।

'ডাক্তার রুহুল আমিন যে কত বড় হোমড়া চোমড়া লোক জানা ছিল না আমার তখন। পরদিন খবরের কাগজ দেখে জানতে পারলাম তিনি ছিলেন এদেশের এক বিরাট ফ্যামিলির যোগ্য সন্তান, কেবল মস্ত ডিগ্রিধারী ডাক্তারই নন, একজন মিনিস্টারের আপন চাচাত ভাই। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন তিনি সেই আমলে গোপনে। অনেক কনট্রিবিউশন আছে। দয়ার সাগর ছিলেন তিনি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন অসংখ্য লোকের। এমন কি বছর তিনেক আগে শিকারে গিয়ে টেকনাফের কাছে তিরমিজ বলে একটি দ্বীপের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশায় এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে সেই থেকে প্রত্যেক মাসে দুইবার করে নিজের খরচায় প্লেনে করে সেখানে গিয়ে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে আসতেন তিনি ওদের। ইত্যাদি, ইত্যাদি অনেক মহৎ কর্ম করে রেখেছিলেন তিনি—গত ক'দিনের কাগজ দেখলেই সব জানতে পারবেন।

'চোর, ডাকাত, রাজাকার, আলবদর যখন নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের বুকে, পুলিসের নাকের ডগায় বসে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে যখন কালোবাজারী, দুষ্কৃতিকারী আর মজুতদারদের দল, তখন পুলিস বিভাগের নিরীহ, নির্দোষ সম্মানীয় নাগরিকের জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল সব কটা পত্রিকা। সরকার বাধ্য হলেন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন করতে। তিনদিন পর বিচার শুরু হলো সকাল দশটায়।

'নানান ভাবে জেরা করা হলো আমাকে। ঠিক কতটা দূরে প্রথম দেখতে পাই, কতদূর থাকতে হ্যান্ডস আপ বলি, কোন্ ভাবটা আমার সন্দেহ উদ্রেক করল, ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা হলো প্রথমে। তারপর আমাকে বসতে বলে ডাকা হলো ওই বাড়িরই এক বৃদ্ধা বাসিন্দা মিসেস জোন্স্‌কে। মহিলা দেশী খৃষ্টান, আশি-বিরাশি বছর বয়স, বিধবা। কিছু মনে থাকে না তাঁর। পরলোকগত স্বামীর অগাধ টাকা আছে ব্যাঙ্কে, মাসে একহাজার করে টাকা পৌঁছে দেয়া হয় ওঁর কাছে। একা মানুষ, ভালভাবেই চলে যায় ওঁর। জানা গেল প্রত্যেক মঙ্গলবার ডাক্তার সাহেব ওকে দেখাশুনা করতে যেতেন, চিকিৎসা করতেন বিনা পয়সায়। সেদিন, মঙ্গলবার, ওঁকে চিকিৎসার জন্যেই গিয়েছিলেন তিনি তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে। ডাক্তারের মধ্যে কোন রকম অস্থিরতা বা অস্বাভাবিকতা দেখতে পাননি তিনি সেই রাতে। শুধু ঝড় বৃষ্টির ব্যাপারে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। টম্ ঘরের বাইরে ছিল, ওকে খুঁজে ঘরে পাঠিয়ে দেবেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। টম্ হচ্ছে বুড়ির বুড়ো

কুকুর। ডাক্তার খুব পছন্দ করতেন কুকুরটাকে, মাঝে মাঝেই খেলনা এনে দিতেন ওকে। ডাক্তার বেরিয়ে যাওয়ার খানিক পরেই চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন বৃদ্ধা, তার কিছুক্ষণ পরই গুলির শব্দ। কি ঘটছে বুঝতে পারেননি, কিন্তু ভয়ানক ভয় পেয়েছিলেন।

'এরপর ডাকা হলো রুস্তম আলীকে। অত্যন্ত সৎ অফিসার। ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ার পর টেলিফোনে খবর পেয়ে ও. সি. সাহেব ঘটনাস্থলে পৌঁছলেই আমি থানায় ফিরে এসে রিপোর্ট লিখতে বসি, ফলে ওখানে কি ঘটেছে আমি জানতাম না। রুস্তম আলীর জবানবন্দী শুনে কেঁপে গেলাম আমি। জানা গেল, পিস্তলটা পাওয়া যায়নি কোথাও। আশে পাশের সমস্ত জায়গা চষে ফেলা হয়েছে, পুকুরে ডুবুরী নামিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু ডাক্তারের সেই পিস্তলটা গায়েব হয়ে গেছে বেমালুম। আরও জানা গেল, পিস্তলের লাইসেন্স নেই ডাক্তারের, অর্থাৎ তার কাছে পিস্তল থাকার কথা নয়, ওটা আমার চোখের ভুল। রুস্তমকে বিদায় দিয়ে ডাকা হলো একজন ই. এন. টি. স্পেশালিস্টকে। তার কাছ থেকে জানা গেল ডক্টর রুহুল আমীন অটোসক্লেরোসিস রোগে ভুগছিলেন। অর্থাৎ কানের ভেতর একটা হাড় শক্ত হয়ে যাওয়ায় হিয়ারিং এইড ব্যবহার করতেন। কিন্তু ওটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ব্যাটারি-ডাউন ছিল। এ থেকে আঁচ করে নেয়া হলো, খুব সম্ভব চিৎকার করে আমি যা বলেছিলাম তিনি বুঝতে পারেননি।'

'কিন্তু তাহলে দৌড় দিলেন কেন?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সোহানা।

'সেটা আমারও প্রশ্ন। কিন্তু কমিশনের ধারণা, হঠাৎ আমাকে দেখে গুণ্ডা বদমাইশ মনে করেই উনি দৌড় দিয়েছিলেন। পিস্তলটা আমার কল্পনার আবিষ্কার। আমি দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত একজন নিরীহ নিরপরাধ নাগরিককে হত্যা করেছি। আমার বস্—শিকদার সাহেবকে ডাকা হলো সবশেষে। সত্যিসত্যিই আমার সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা আমার জানা নেই, কিন্তু সেদিন তিনি কমিশনের সামনে যা বললেন সেটা সংক্ষেপে দাঁড়ায়—আমার মত সৎ, সাহসী, ও কর্তব্যপরায়ণ পুলিস অফিসার তিনি খুব কমই দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস আমার প্রতিটা কথা সত্য। পিস্তলটা পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু চেষ্টা করলে হয়তো এ রহস্য ভেদ করা অসম্ভব নয়। অতীতে আমি কি কি ভাল কাজ করেছি তার উপর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও দিলেন। কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। সাসপেন্ড করা হলো আমাকে। আপীল করলাম।

'এদিকে খবরের কাগজে জোর লেখালেখি চলছে তখনও। ফৌজদারী আদালতে আমার বিচারের দাবি উঠেছে। একটা ব্যাপারে ততক্ষণে আমি পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি—সবাই আমার বিরুদ্ধে। পাবলিক সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে আমাকে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে একটি মাত্র উপায় আছে—সেটা হচ্ছে, প্রমাণ করা যে ডাক্তার নিরীহ নিরপরাধ লোক ছিলেন না।

■. 'ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খোঁজ খবর■করতে গিয়েই আসল বিপদে পড়লাম। নিজের অজান্তেই কারও আঁতে ঘা দিয়ে বসেছি আমি। ফলে আমার বিরুদ্ধে শক্ত ক্রিমিনাল চার্জ আনা হলো। ইচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগ। ঘটনার কয়েকদিন আগে একটা টিন-এজারের জুয়ার আড্ডায় হামলা করার সময় ডাক্তারের ছেলের সাথে হাতাহাতি হয়েছিল আমার। অবশ্য সেই আড্ডায় ডাক্তারের ছেলে ছিল কিনা জানতাম না আমি গতকাল পর্যন্ত সেই হাতাহাতির সময় একা পড়ে যাওয়ায় মার খেয়েছিলাম আমি ওদের হাতে। আমি নাকি প্রতিশোধ নেবার জন্যে জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করেছি শাব্বিরের বাবা ডক্টর রুহুল আমীনকে। খুন করে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে গল্প তৈরি করেছি যে পিস্তল বের করেছিলেন ডাক্তার।

'বেইল পেলাম না। বসকে ধরে হাজতে ঢোকার আগে আপনার সাথে দেখা করবার সুযোগ চেয়েছিলাম। উনি সে সুযোগ দিয়েছেন। বিশ মিনিট সময় ছিল আমার হাতে, শেষ হয়ে গেল। সাহায্য পাব আপনার, মাসুদ ভাই?'

মৃদু হাসল রানা মাহবুবের উদগ্রীব মুখের দিকে চেয়ে। মাথা ঝাঁকাল।

'পাবে।' একটা কলিং বেল টিপল রানা। সালমা এসে ঢুকতেই চারটে আঙুল দেখাল। অর্থাৎ চারটে ফান্টা। 'ডাক্তারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কি জানতে পেরেছ?'

'জানতে পারলাম, পাঁচ লাখ টাকার ইনস্যুরেন্স ছিল ডাক্তারের। গত দশ বছর ধরে নিয়মিত আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটে জুয়া খেলতেন তিনি উঁচু স্টেকে। নিয়মিত হারতেন। বছর চারেক আগে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছিলেন তিনি জুয়ায়। এক বছর খুব কষ্টে কাটিয়েছেন। তারপরেই হঠাৎ জিততে শুরু করেছেন অসম্ভব হারে। গত তিন বছর শেয়ার মার্কেটেও প্রচুর লাভ করেছেন। বর্তমান ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স পনেরো লাখ টাকা। চেম্বার আছে একটা বায়তুল মোকাররমে, কিন্তু প্র্যাকটিস খুবই সামান্য। এত টাকা কিভাবে উপার্জন করছেন তিনি এত অল্প সময়ে জানা গেল না। ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে আমার কাছে। মনে হলো কেউ যেন আমার চোখ চেপে ধরতে চায়। দেখতে দিতে চায় না ডাক্তারের জীবনের এই দিকটা।'

ফান্টা খেয়েই উঠে পড়ল ও. সি. জালাল শিকদার। মাহবুবকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলে ঝুঁকে পড়ল টেবিলের উপর।

'একটা কথা বলে যাই। এ ব্যাপারে যখন যেমন দরকার আমার সাহায্য গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না মিস্টার মাসুদ রানা। সব রকম সাহায্য করব আমি আপনাকে। এটা কেবল মাহবুবের ব্যক্তিগত ব্যাপারই নয়, পুলিস বিভাগের সম্মানও নির্ভর করছে এর উপর। এ ব্যাপারটা মুখ বুজে মেনে নিতে হলে দায়িত্ব পালন করতে দ্বিধা আসবে পুলিসের মনে।'

'পিস্তলটার কথা আপনি বিশ্বাস করেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'করি। চোখের ভুল যে হতে পারে না এমন নয়। কিন্তু নিশ্চয়ই ওই জাতীয়

কিছু বের করেছিল ডাক্তার। নইলে গুলি করবে কেন মাহবুব? অন্য কিছু হলেও তো সেটা আমাদের খুঁজে পাওয়ার কথা। কিছু একটা খুঁজে পেলে না হয় বুঝতাম ভুল দেখেছিল মাহবুব অন্ধকারে। কিছুই যখন পাইনি, তখন নিশ্চয়ই কেউ সরিয়েছে সেটা। মাহবুবের কথা অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।'

'পুলিসের লোক ছাড়া বাইরের কেউ গিয়েছিল ঘটনাস্থলে?'

'না। ঘিরে নিয়েছিলাম আমরা জায়গাটা।'

'আপনার কোন লোক করেনি তো কাজটা?'

'কথাটা আমার মনেও জেগেছিল। সেই রাতেই। আমি নিজ হাতে সার্চ করেছি প্রত্যেককে। পাইনি।'

'ঠিক আছে মিস্টার শিকদার, প্রয়োজন হলেই আপনার শরণাপন্ন হব আমি।'

বেরিয়ে গেল ভারী পা ফেলে জালাল শিকদার। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল ওকে রানা। চট্ করে সারা ঘরে একবার চোখ বুলাল সোহানা। যা খুঁজছিল পেল না। ওকি আশা করেছিল একটা লাল টেলিফোন সেট দেখতে পাবে এ কামরায়?

বাথরুমের দরজা খুলে উঁকি দিল গিলটি মিঞা।

# তিন

রানার পিছু পিছু সিনেমা হল থেকে চোরের মত বেরোচ্ছিল সোহানা, পিছন থেকে আঁচল ধরে টানল নায়লা

'কিরে, তোর না অসম্ভব মাথা ধরেছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল নায়লা।

'সেরে গেছে।' লজ্জায় লাল হয়ে গেল সোহানা।

'কেউ টিপে দিয়েছে বুঝি?'

'যা অসভ্য কোথাকার!'

'বল্ না কোনজন? সামনেরটা?'

'না, তোর পিছনেরটা।'

কোনমতে নায়লার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে গাড়িতে এসে উঠল সোহানা।

'এবার কোন দিকে যাবে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'চলো শুধু শুধু ঘুরে বেড়াই খানিক।' গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'মাহবুব সাহেবের ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না।'

'কি ভাবছ?'

'ভাবছি পিস্তলটা যাবে কোথায়? এ ব্যাপারে দারোগার কোন হাত নেই তো?'

'ভুল লাইনে ভাবছ তুমি, সোহানা সোজা, সরল ও সৎ অফিসার হিসেবে শিকদার সাহেবের সুনাম প্রতিষ্ঠিত। সততার জন্যে প্রমোশন হয়নি তার গত

পনেরো বছর। মাহবুব ছেলেটা তার নিজের হাতে গড়া। তাছাড়া মাহবুবের অনুরোধ অনায়াসেই উপেক্ষা করতে পারত সে। তার যদি হাত থাকত তাহলে আমার কাছে নিয়ে আসত না ওকে।'

'তাহলে যাবে কোথায় সেটা? সেক্ষেত্রে ভাবতে হয় যে চোখের ভুল হয়েছিল মাহবুব সাহেবের।' অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল সোহানা। 'কিভাবে এগোতে চাও তুমি?'

'কোন সূত্র দেখতে পাচ্ছি না। একমাত্র উপায় সূত্র তৈরি করে নেয়া। পুরো ব্যাপারটা শুনে মনে হচ্ছে কোথাও শক্ত একটা গিট আছে। কিন্তু গোড়া থেকেই আরম্ভ করতে হবে আমাদের। প্রথমেই ওই বাড়ির লোকজনের সাথে আলাপ করতে হবে, তারপর ভেবে দেখব কোন্ পথে এগোনো যায়।'

'চলো না এখনই যাই?'

'তর সইছে না বুঝি?' হাসল রানা। 'ঠিক আছে, চলো।'

কার পার্কে গাড়ি রেখে নেমে পড়ল ওরা। শেষ বিকেল। আঁধার হতে আরও আধঘণ্টা।

দেয়াল ঘেরা বিরাট কম্পাউন্ড। বারো তেরো ও চোদ্দ নম্বর লেখা তিনটে ফ্ল্যাট বাড়ি পাশাপাশি। তিনটে নিয়ে এক ইউনিট। মালিক খুব সম্ভব একজনই। চমৎকার সুন্দর প্ল্যান মাফিক সাজানো। ছবির মত।

মাহবুব কোন্ ঝোপটার আড়ালে লুকিয়েছিল বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। সমস্ত ঘটনাটা যেন চাক্ষুষ দেখতে পেল রানা। পুকুরের ধার পর্যন্ত গেল ওরা পাশাপাশি হেঁটে। সোহানাকে মাথা নিচু করে এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ চোখে চাইতে দেখে হাসল রানা। পিস্তলটা খুঁজছে সে।

তেতলা ও দোতলার বাসিন্দাদের কাছে জানা গেল না বিশেষ কিছুই। প্রত্যেক তলায় তিনটে করে ফ্যামিলি। বড়লোকি চালের তিন কামরা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট না বলে এগুলোকে অ্যাপার্টমেন্ট বলাই ভাল। ভাড়াটেরা বেশির ভাগই হয় একা নয়তো স্বামী-স্ত্রী ও এক সন্তানের পরিবার। প্রত্যেকে বড়লোক। কেউ কারও খবর রাখে না। সবাই প্রশ্ন না করেই ধরে নিল যে ওরা আই. বি.র লোক। সাবধানে জবাব দিল প্রতিটা প্রশ্নের। অনেকে ডাক্তারকে দেখেনি কোনদিন এ বাড়িতে আসতে, কেউ কেউ আবার জানেই না যে এ বাড়িতে মিসেস জোন্স্ বলে কোন বৃদ্ধা মহিলা থাকে। শহুরে জীবন, যে যার তালে ব্যস্ত, অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবসর নেই। দু'জন জানাল স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমায় তারা, সে রাতে কি ঘটেছিল টেরই পায়নি, পরদিন খবরের কাগজে দেখেছে।

নিচে নেমে এল ওরা। মিসেস জোন্সের কলিংবেল টিপল। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে সেই ফাঁকে চোখ রাখল বৃদ্ধা অপরিচিত লোক দেখেই দরজা বন্ধ করে দিচ্ছিল, চট করে বলল রানা, 'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই মিসেস জোন্স। গত মঙ্গলবারের গোলাগুলির ব্যাপারে

'ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনার কি আসার কথা ছিল? কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট...'

'ডক্টর রুহুল আমীনের মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করছি আমরা।'

ডাক্তারের নামটা উচ্চারণের সাথে সাথেই খুলে গেল দরজাটা। তবু একটু অনিশ্চয়তা ছিল, সোহানাকে দেখে আশ্বস্ত হলো বুড়ি। 'এসো মা, এসো! বসো তোমরা। চা তৈরি করছিলাম—চায়ের সাথে আর কি খাবে? বিস্কুটঅলাটা আসছে না ক'দিন ধরে। উইলি মারা যাওয়ার আগে থেকেই পাঁউরুটি আর বিস্কুট দিয়ে যায় লোকটা আমাকে বাড়িতে এসে। এ বাড়িতেও আসে, একদিন পর একদিন।...কই বসো।'

বসল ওরা পৌরাণিক যুগের একটা সোফায়। কচমচ করে আপত্তি জানাল জীর্ণ স্প্রিংগুলো। সেই সাথে গর্‌র্ একটা আওয়াজ এল টেবিলের নিচ থেকে। একটা ঝুড়িতে বসে কটমট করে চেয়ে আছে ওদের দিকে বুড়ো এক অ্যালসেশিয়ান। 'চুপ করো টম!' আঙুল তুলে শাসন করল বৃদ্ধা কুকুরটাকে। 'অভদ্রতা কোরো না দুষ্টু। তোমার খেলনা চুরি করবে না এরা।' সোহানার দিকে ফিরে বলল, 'ভয় পেয়ো না মা। টম আমার খুবই ভাল মানুষ। বুড়ো হয়ে গেছে তো, দাঁত পড়ে গেছে সব। ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন ওর দাঁত বাঁধিয়ে দেয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করবেন ডেন্টিস্টকে। খুব ভাল মানুষ। মেরে ফেলল ওরা গুলি করে। আমাদের দু'জনের আর কেউ থাকল না।'

'আপনার আত্মীয় স্বজন নিশ্চয়ই আছে?' বলল সোহানা।

'কেউ নেই। কেউ না। আমি আর টম শুধু আছি। একা।' উদাস শোনাল বৃদ্ধার কণ্ঠ। ঘরের কোণে একটা টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধা। একটা চায়ের পট তুলল কাঁপা হাতে। দু'হাতে পট ধরে কাপে ঢালল চা, তবু কিছুটা পড়ে গেল টেবিলের উপর। রানা বা সোহানাকে দিতে ভুলে গিয়ে নিজেই খেতে শুরু করল। মগ্ন কণ্ঠে বলে চলল, 'কথা বলার মত কেউ নেই। বুড়ো হয়ে গেলে কেউ কেয়ার করে না। একমাত্র ডাক্তার ভালবাসত আমাদের। এই বাড়িটাও খুঁজে দিয়েছিল ডাক্তারই। প্রত্যেক মঙ্গলবার এসে দেখে যেত কেমন আছি।'

'ডাক্তারকে কি আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কথাটা খেয়াল করল না বৃদ্ধা। কুকুরটার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। একটা রবারের পুতুল চিবোচ্ছে কুকুরটা আর অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করছে রানা ও সোহানার দিকে। 'ডাক্তার ছাড়া কাউকে দেখতে পারে না টম। ওই পুতুলটা উপহার দিয়েছিল ডাক্তার ওকে ওর জন্মদিনে। সেই জন্যেই এত প্রিয় ওটা ওর। মান-অভিমানের খেলা চলত ওর ডাক্তারের সাথে। প্রায়ই কিছু না কিছু আনত ডাক্তার ওর জন্যে! মাঝে মাঝে ভান করত যে ভুলে গেছে। কিছুতেই আর বের করে না। আশায় আশায় থাকত ও। আমি ভাবতাম বুঝি সত্যিই ভুলে গেছে। কিন্তু

না, শেষ মুহূর্তে যাবার সময় বলত—এই দেখো, ■ এনেছি তোমার জন্যে!' দুই ফোঁটা জল ঝরে পড়ল বৃদ্ধার ভাজ ভাজ গালের উপর। রুমাল দিয়ে মুছল সে চোখের জল।

'ডাক্তারকে আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছিলেন নিশ্চয়ই?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'না না। তা কি করে করব?'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে তিনি ছিলেন আপনার সন্তানের মত। আপনার আর কোন আত্মীয়স্বজন নেই যখন…'

'কিন্তু ব্যাঙ্কের টাকাগুলো তো আমার নয়। যতদিন বেঁচে আছি সুদের থেকে টাকা পাব। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর টাকাগুলো পাবে সরোজিনী হাসপাতাল। উইলি, আমার স্বামী, সেই ব্যবস্থাই করে গেছে।'

রানা বুঝল ওদিক থেকে অগ্রসর হয়ে লাভ নেই। সম্পত্তি-লোভী ডক্টর রুহুল আমীনকে দাঁড় করানো যাচ্ছে না; বলল, 'অনেক ধন্যবাদ মিসেস জোন্‌স্‌। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম। আমরা আসি এখন।'

বহুদিন পর কথা বলবার সুযোগ পেয়ে ওদের ছেড়ে দেবার বিশেষ ইচ্ছে দেখা গেল না বৃদ্ধার। কিন্তু উঠে দাঁড়াতে দেখে আপত্তি করল না। বলল, 'আবার এসো বাবা। তুমি ভাগ্যবান। খু-উ-ব সুন্দর বউ পেয়েছ। কক্ষোনো কষ্ট দিয়ো না ওর মনে।'

বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। বাকি রইল দুটো ফ্ল্যাট। ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে বুড়ির ওখানে। মিসেস জোন্‌সের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটটায় থাকে কে. হক। দরজায় নেমপ্লেট লাগানো। বেল টিপে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। লেটার বক্সের ঠাসা চিঠি আর দরজার নিচে জমা খবরের কাগজ দেখে বোঝা গেল এ. ফ্ল্যাটের ভাড়াটে গত কয়েকদিন ধরে অনুপস্থিত। বাকি রইল কামরুজ্জামান চৌধুরী: বার কয়েক বেল টিপতেই ভিতর থেকে চটুল পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আগে দেখো বাবা। সাহায্য হবে না।'

'দরজাটা খুলুন। কিছু কথা আছে।'

'বুঝতে পেরেছি বাবা তোমার অনেক দুঃখ। তিন দিন তিনরাত না খেয়ে আছ। কিন্তু আমিও না খাওয়া। আমারও অনেক দুঃখ। এখানে সুবিধা হবে না, আগে দেখো।'

হাসল রানা ও সোহানা পরস্পরের দিকে চেয়ে। গলার স্বরটা আরেক পর্দা চড়িয়ে রানা বলল, 'ডক্টর রুহুল আমীনের মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করছি আমরা। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

দরজা খুলল ফুলপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরা হাসি মুখ এক অল্প বয়সী যুবক। বলল, 'খোদার কসম, বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি।' সোহানাকে দেখেই সপ্রতিভ বিব্রত কণ্ঠে বলল, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। আসুন ভিতরে আসুন।'

'বিরক্ত করলাম আপনাকে…' ড্রইংরুমে ঢুকল ওরা যুবকের পিছন পিছন: বসল সোফায়।

'না না মোটেই না। রাত দশটা পর্যন্ত আমার অফ।' আলনা থেকে টান দিয়ে একটা হাওয়াই শার্ট নিয়ে পরে ফেলল কামরুজ্জামান চট্‌পট্‌। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাদের?'

'ডাক্তারের মৃত্যুর সময় আপনি কোথায় ছিলেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'আকাশে।' ওদের দু'জনকে একটু অবাক হয়ে চাইতে দেখে বলল। 'খোদার কসম!'

'তারমানে আপনি একজন পাইলট?'

'শিশু, সুন্দরী মহিলা, আর আমার মার কাছে আমি পাইলট। আসলে আমি পি.আই.এ..থুরি, বাংলাদেশ বিমানের একজন কো-পাইলট।' হাসল কামরুজ্জামান। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনারা খুব সম্ভব সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলমের হয়ে তদন্ত করছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। আর ইনি সোহানা চৌধুরী। আমাদের মনে হয় ঘটনার সবটা প্রকাশ পেলে হয়তো বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে মাহবুব।'

'আপনাদের সাহায্য করতে পারলে আমি খুবই সুখী হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে রাত্রে আমি ঢাকাতেই ছিলাম না। লণ্ডন থেকে আসছিলাম, কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্যে গতি পরিবর্তন করে দমদমে জাহাজ নামাতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার জীবনের ট্র্যাজেডিই হচ্ছে এটা। যেখানে জমজমাট চাঞ্চল্যকর কোন ঘটনা ঘটবে, আমাকে থাকতে হবে তার থেকে দূরে। কোনদিনই অন্‌ দ্য স্পট থাকার সুযোগ হয় না।'

'ডাক্তার রুহুল আমীনকে চিনতেন আপনি?'

'জীবনে কোনদিন দেখিনি। অন্যান্য ভাড়াটেদের সাথে আলাপ করলে…'

'সবার সাথেই আলাপ করেছি। আপনার পাশের ফ্ল্যাটের হক সাহেব ছাড়া। মনে হচ্ছে উনি ঢাকার বাইরে আছেন। ওঁর সম্পর্কে কিছু জানেন?'

মুচকি হাসল পাইলট। 'হক সাহেব নয়, হক মেম সাহেব! মিস কুমকুম হক। মডেল। ফটোগ্রাফারের জন্যে পোজ দেয়। ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি। কিন্তু খাতির জমাতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও।'

কামরুজ্জামানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। কুমকুম হকের দরজার কাছে জমে থাকা গত ক'দিনের পত্রিকাগুলো উল্টে পাল্টে দেখল রানা। লেটার বক্সের চিঠিগুলো উল্টে পাল্টে দেখল, তারপর সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

'যে তিমিরে সেই তিমিরেই। তাই না?' প্রশ্ন করল সোহানা।

জবাব দিল না রানা। কি যেন ভাবছে সে। গাড়িটা সোজা সোহানার বাড়ির

আপনাকে সানশাইন...'

'জ্বি না আমি মডেল নই, কেউ পাঠায়নি আমাকে। আমি নিজে এসেছি আমার বান্ধবী কুমকুম হকের খোঁজে।'

'কুমকুম...হ্যাঁ...কুমকুম। বড় ভাল মেয়ে।' হঠাৎ কি মনে পড়ে যাওয়ায় রেগে গেল শরীফ আহমেদ। চোখ পাকাল। 'ওকে খুঁজে পেলে বোলো আমি খুব রেগে আছি ওর ওপর। ভয়ানক চটে গেছি আশ্চর্য! পাজী মেয়ে, কথা দিয়ে কথা রাখল না এবার এলে মার লাগাব আমি।'

'কথা রাখতে পারেনি বুঝি?'

'নাহ পাত্তাই নেই। সেই গত বুধবার আসার কথা ছিল, একটা ফোন করেও জানাতে পারত?'

'বাড়িতে নেই সে গত বুধবার থেকে। কোথায় যেতে পারে সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে পারেন?'

'বাড়িতে নেই?' চিন্তিত হয়ে পড়ল শিল্পী। হঠাৎ কি মনে পড়ায় চিন্তা দূর হলো। 'ওর এক প্রেমিক ছিল, কথায় কথায় বলেছিল একদিন আমাকে। নাম ধাম জিজ্ঞেস করিনি। খুব সম্ভব অবৈধ প্রেম। আচ্ছা...সাতদিন বলছ... কিছু হয়নি তো ওর?' বিচলিত মনে হলো শিল্পীকে।

'এরকম ধারণা হচ্ছে কেন আপনার?'

'শেষ যেদিন এল সেদিন কেমন যেন অস্বাভাবিক লেগেছিল আমার কাছে ওর ব্যবহার। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমাকে মামা বলে ডাকত, এত করে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম—কি হয়েছে আমাকে বল, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি, কিন্তু কিছুই বলল না। শরীর খারাপ করছে বলল শুধু। হাসিখুশি মানুষটার এরকম ব্যবহার দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেই থেকে।'

সোহানা বুঝল, খেয়ালী লোক, যখন যা মনে আসছে, প্রাণ থেকে অনুভব করে বলছে। কিন্তু মনে রাখছে না কোন কথা। একটু পরেই সানশাইন অ্যাডভারটাইজারস থেকে নিযুক্ত মেয়েটা সুইমিং কস্টিউম নিয়ে এসে পৌঁছলেই ভুলে যাবে শিল্পী সব কিছু। যা জানা গেল সোহানার ধারণা তা যথেষ্ট। রানার সাথে দেখা করে ওর বক্তব্য পেশ করার জন্যে ছটফট শুরু হয়ে গেছে ওর মনের মধ্যে।

'অনেক ধন্যবাদ, আমি উঠি এখন! উঠে দাঁড়াল সোহানা।

'আরে, তুমি...মানে...আপনি চা-টা খেয়ে যাও। আনতে পাঠিয়েছি একঘণ্টা আগে।' বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে চিৎকার জুড়ল শিল্পী, 'ভোলা! ভোলা! চা আনতে গিয়ে তুই বিস্কুট হয়ে গেলি নাকিরে!' কণ্ঠস্বর নামিয়ে সোহানাকে বলল, 'একটু বসো ড়ালিয়া, রিকশা ডেকে দিচ্ছি ভোলাকে দিয়ে।'

ভোলার গুরু, ভোলা দি গ্রেট—ভাবল সোহানা। বলল, 'তার দরকার হবে না। ধন্যবাদ। চলি এখন তাহলে, আদাব।'

'ঠিক আছে, এসো। আর শোনো, যে কোন দিন সকাল দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে একবার এসো। তোমার মুখের বাম দিকটা বেস্ট আসবে। এমন একটা পোর্ট্রেট তুলে দেব না, দেখানোর সাথে সাথেই বিয়ে হয়ে যাবে। আর শোনো, পারলে কুমকুমকে ধরে নিয়ে এসো। পিটিয়ে লাশ করব ওকে আমি···

সকাল ন'টা। নাস্তা সেরে নাস্তার টেবিলেই গত কয়েক দিনের খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। কাল রাতেই সংগ্রহ করেছে সে এগুলো মন দিয়ে পড়ল সে প্রতিটা কাগজে ডক্টর রুহুল আমীনের মৃত্যু সংক্রান্ত প্রত্যেকটি লেখা। পাল্লা দিয়ে লিখতে লিখতে ডাক্তারকে দেবতা বানিয়ে ফেলেছে কাগজগুলো, আর সেই সাথে ক্রমে ক্রমে নরকের কীটে পরিণত হয়েছে দায়িত্বজ্ঞানহীন সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলম। একে অপরকে টেক্কা দেবার জন্যে আরও তীক্ষ্ণ, আরও শাণিত করেছে বক্তব্যের ভাষাকে। যেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে জেহাদ ঘোষণা করেছে কাগজগুলো।

পুরো একটি ঘন্টা এবং দুই কাপ চা ব্যয় করল রানা সবটা ব্যাপার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করে নিতে। মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওর নতুন কেনা টয়োটা করোনা নিয়ে। মাহবুবের শেষ কথাগুলো যাচাই করে নিতে হবে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে সময় লাগল দুই ঘন্টা। আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখা করল পুরানো এক বন্ধুর সাথে। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সব তারিখ টুকে নিয়ে বেরিয়ে এল সে বাইরে। মাহবুবের তথ্য নির্ভুল। বছর তিনেক আগে হঠাৎ কপাল খুলে গিয়েছিল ডাক্তারের। চাং-ওয়ার দিকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কেন যেন মনে হলো রানার, অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে।

ঠিক দুটোর সময় পৌঁছল রানা চাং-ওয়া রেস্টুরেন্টে, দোতলায় একটা নিরিবিলি টেবিলে বসে আছে সোহানা। রানা গিয়ে পৌঁছতেই বলল, 'একটা সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার। কুমকুম হকের অ্যাপার্টমেন্টটা সার্চ করার প্রয়োজন বোধ করছি।'

'ওরেবাব্বা!' চোখ বড় বড় করল রানা 'তুমি দেখছি দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে গেছ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, দারোগাকে ফোন করে ডেকে আনি আগে। এক সাথেই শোনা যাবে সব কথা'

সোহানাকে আপত্তি করতে না দেখে একটু অবাক হলো রানা। নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পেরেছে ও। ওয়ারেন্ট বের করতে হলে দারোগাকে ছাড়া হবে না। কাজেই নিচে নেমে এসে ফোন করল সে রমনা থানায়।

'জালাল সাহেব?···হ্যাঁ, মাসুদ রানা।···খাওয়া দাওয়া হয়েছে?···চলে আসুন। চাং-ওয়া রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের দাওয়াত আপনার।···এক্ষুণি। দশ মিনিটের মধ্যে।··· দোতলায়। আপনার জন্যে অর্ডার দিচ্ছি তাহলে। চলে আসুন।'

উপরে এসে বসল রানা। বেয়ারা লিখে নিল স্যপ, ফ্রায়েড রাইস উইথ চিকেন, সুইট সাওয়ার প্রণ, ভেজিটেবলস উইথ চিলি, ইত্যাদি ইত্যাদি ছয় সাতটা ডিশের ফিরিস্তি। তিনজনের প্লেট সাজাতে বলল রানা পাশের টেবিলে।

'তুমি কি কি করলে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'কাজ এগোতে পারিনি, কিন্তু মাহবুবের কিছু কথা কনফার্ম করেছি। ঈস্ট এশিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানীতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে গিয়েছিলাম আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটে। সত্যি পাঁচ লাখ টাকার লাইফ ইনস্যুরেন্স ছিল ডাক্তারের। অ্যাকসিডেন্টাল বেনিফিট তিন গুণ—অর্থাৎ দাঁড়াচ্ছে পনেরো লাখ। টাকাটা যতশীঘ্রি সম্ভব ডাক্তার-গিন্নীর হাতে তুলে দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কোম্পানী। কারণ টাকা যখন দিতেই হবে, ব্যাপারটা গরম থাকতে থাকতেই যদি পেমেন্ট করা যায়, তাহলে এফিশিয়েন্সীর চমৎকার বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে এই সুযোগে।' সিগারেট ধরাল রানা একটা। 'আর আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটের সিকিউরিটি-ইন-চার্জ মতিউর রহমান বলল, ওদের ওখান থেকে টাকা জিতে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য নেই কারও। এটা এক কথায় অসম্ভব। অবশ্য কেউ যদি কাউকে জুয়ার মাধ্যমে ঘুষ বা যে কোন রকম বে-আইনী টাকা দিতে চায় তাহলে আলাদা কথা।'

'অর্থাৎ মতিউর রহমান বলতে চায় যে ডাক্তার জুয়ার মাধ্যমে ঘুষ বা বে-আইনী টাকা পেয়েছে?'

'সরাসরি বলেনি, তবে কথাটার মানে ব্যাখ্যা করলে এই রকমই দাঁড়ায়।'

'কিন্তু জুয়াতে ভাগ্য বলে একটা ব্যাপার রয়েছে। না জিতলে টাকা দেবে কি করে।'

'জেতার দরকার হয় না। মনে করো আমি তোমাকে একলাখ টাকা দিতে চাই। শুধু শুধু নিলে টাকাসহ ধরা পড়ে যেতে পারো, কোথায় পেলে সে জবাব দিতে পারবে না তুমি। কাজেই তোমাকে নিয়ে যাব আমি কোন জুয়ার অনুমোদিত আড্ডায়। টাকাটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে নিলাম। প্রথম বার তুমি জিতলে, দিলাম এক ভাগ; দ্বিতীয়বার তুমি হারলে, তাও দিলাম আরেক ভাগ; তৃতীয়বারও হারলে, তবু দিলাম এক ভাগ। ব্যস চুকে গেল।'

'উহুঁ। তবু একটা পয়সা পাই,' হাসল সোহানা।

'কিভাবে? তিন ভাগই দিয়ে দিয়েছি।'

'এক লাখ টাকাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগে তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা। কিন্তু তিন ভাগ যোগ দিয়ে দেখো এক পয়সা কম পড়বে। ওটা না দিলে এক লাখ পুরো হবে না কিছুতেই।'

'ঠিক আছে বাবা, অত অঙ্ক বুঝি না।' পকেট থেকে একটা পয়সা বের করে রাখল রানা সোহানার হাতের তালুতে। 'হয়েছে এবার?'

'হয়েছে।' যেন পুরো টাকা বুঝে পেয়েছে এমনি ভাবে রেখে দিল সোহানা

পয়সাটা ব্যাগের ভিতর।

ভারী পা ফেলে উপস্থিত হলো ইউনিফরম পরিহিত ও. সি. জালাল শিকদার। দারোগাকে দেখেই বেয়ারাদের তৎপরতা দ্বিগুণ হয়ে গেল। খানা রেডি হতেই পাশের টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। ন্যাপকিনটা কোলের উপর বিছিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরল দারোগা রানার মুখের দিকে। পাকানো গোঁফে তা দিল একবার।

'কিছু বের করতে পারলেন?' এক চামচ স্যুপ মুখে তুলল দারোগা।

'মিস সোহানা কিছু বলতে চান আমাদের। নাও সোহানা, শুরু করো। কেন তোমার সার্চ ওয়ারেন্ট দরকার?'

ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে যা জানা গেছে বলল সোহানা সেখান থেকে গিয়েছিল সে নিউ সার্কুলার রোডের সেই তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে। লেটার বক্সের চিঠিগুলো চুরি করে গাড়িতে নিয়ে পড়েছে সে। একটা চিঠির বিশেষ তাৎপর্য আছে। কে এক শামসুল ইসলাম ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে কুমকুমকে। পূর্বতম প্রেমিক সে কুমকুমের। আগের চিঠির জের টেনে লিখেছে: অবৈধ প্রেম যদি বন্ধ না করে তাহলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধাবে সে। অ্যাসিড ছুঁড়ে নষ্ট করে দেবে কুমকুমের চেহারা, তারপর আত্মহত্যা করবে। চিঠিটা পড়ল যথাক্রমে রানা ও দারোগা সাহেব।

'এ থেকে সার্চ ওয়ারেন্টের প্রশ্ন আসছে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। ফ্রায়েড রাইস নিল সে প্লেটে।

'আমার যা ধারণা, সেটা বলি আগে। আমার ধারণা, পারিবারিক জীবনে অসুখী ডাক্তার রুহুল আমীনের প্রেমিকা ছিল কুমকুম। বুড়ি মিসেস জোনস্‌কে চিকিৎসা করতে যাওয়ার ছল করে ডাক্তার যেত আসলে কুমকুমের কাছে। বুড়িকে ওই ফ্ল্যাটটা সংগ্রহ করে দেয় এই ডাক্তারই। ক্যামোফ্লেজের জন্যে। কারও সন্দেহের কোন কারণ নেই বিনা পয়সায় এক বৃদ্ধাকে চিকিৎসা করার জন্যে মহৎ এক ডাক্তার যাওয়া আসা করে তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে—কার কি বলবার থাকতে পারে? সবই ঠিকঠাক, কিন্তু পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামসুল ইসলাম। হুমকি দিচ্ছে প্রেমের দোহাই দিয়ে, প্রেম আজ মৃত।'

'কিন্তু সে সবের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?' প্রশ্ন করল জালাল শিকদার।

'আমি আসছি সে প্রশ্নে। ধরা যাক, সে রাতে ডাক্তারকে সামসুল ইসলামের হুমকির কথা বলেছিল কুমকুম। হয়তো চিঠিও দেখিয়েছিল ভয় পেয়েছিল ডাক্তার। সেজন্যেই বেশি রাত পর্যন্ত ছিল ডাক্তার মিসেস জোনসের ঘরে, জানালা দিয়ে বাইরে লক্ষ করছিল বারবার। যখন বুঝল বিপদের সম্ভাবনা নেই তখন গুটি গুটি বেরিয়ে এল সে বাইরে। এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। যে কারণে সন্দেহ জন্মাল মাহবুবের মনে। হঠাৎ একটা লোককে লাফ দিয়ে টর্চ হাতে উঠে দাঁড়াতে দেখেই ডাক্তার ভাবল নিশ্চয়ই শামসুল ইসলামের খপ্পরে পড়েছে। দৌড় দিল আতঙ্কিত ডাক্তার। তারপর ঘটল যা ঘটবার। পালিয়েছে কুমকুম ঝামেলা ও

'বদনামের ভয়ে।' খাওয়ায় মনোযোগ দিল সোহানা।

'হতে পারে।' সামনে ঝুঁকে এল দারোগা সাহেব। খুবই পছন্দ হয়েছে ওর সোহানার গল্পটা।

'কিন্তু ছোট্ট একটা প্রশ্ন বাকি থেকে যায়,' বলল রানা। 'হারানো পিস্তলটা? সেটা কোথায় গেল?'

অসহিষ্ণু ভাবে হাত নাড়ল দারোগা। 'একবারেই সব উত্তর পাওয়া যাবে এমন আশা করছেন কেন? এইটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই অনেক কাজ এগিয়ে যাবে আমাদের। এতদিন পিস্তলের ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সবাই। পিস্তলটা পাওয়া যায়নি, এজন্যেই কেবল নয়, ডাক্তারের কাছে পিস্তল থাকার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। যদি প্রমাণ করা যায় যে পিস্তল ক্যারি করার যথেষ্ট কারণ ছিল ডাক্তারের—অনেকটা এগিয়ে গেল। পিস্তলটা হয়তো কুমকুম হকের। হয়তো আত্ম-রক্ষার জন্যে দিয়েছিল সে ওটা ডাক্তারকে…'

হাসল রানা। 'এবং হয়তো একটা লম্বা রাবার বাঁধা ছিল পিস্তলটায়। হাত থেকে খসে পড়তেই ঝট করে ফিরে গেছে সেটা কুমকুমের ঘরে! যাই হোক সার্চ করে কুমকুমের ঘরে কি পাওয়ার আশা করো তুমি সোহানা?'

জবাব দিল জালাল শিকদার। 'ডাক্তার যদি সত্যি সত্যিই কুমকুমের প্রেমিক হয়ে থাকে, তাহলে কিছু না কিছু প্রমাণ আমরা পাবই ওর ঘরে। হয়তো কোন ছবি, কিংবা একটা লুঙ্গি, কিংবা একজোড়া স্লিপার, কিছু পাওয়া যাবেই। যদি প্রমাণ করা যায় যে যতটা মহাপুরুষ বলে মনে করা হচ্ছে আসলে ততটা ছিল না ডাক্তার, তাহলে অনেকটা হালকা হয়ে যাবে মাহবুবের কেসটা। আজকেই সার্চ করা উচিত।'

খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছে সিগারেট ধরাল রানা। পুডিং এল, এক চামচ খেয়ে সরিয়ে রাখল সেটা।

সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'মাহবুব সাহেবের শেষের কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করোনি রানা?'

'করেছিলাম।'

'তাহলে আজ আবার যাচাই করতে গিয়েছিলে কেন?'

'ওই লাইনে এগোতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল মাহবুব, আমিও বিপদে পড়তে চাই।'

খাকি পোশাক দেখেই ছুটে এল ম্যানেজার মতলব আলী। ওই বাড়িরই চিলেকোঠায় থাকে সে। বারো, তেরো ও চোদ্দ—এই তিনটে ফ্ল্যাট-বাড়ির ম্যানেজার। চোখ দুটো বসা, বিরক্ত অভিব্যক্তি সারা মুখে, গালে একটা কাটা দাগ। লোকটাকে দেখে বোঝা যায় ভাড়াটেদের অভিযোগ শুনতে শুনতে জীবনটা অস্থির হয়ে আছে তার।

'কি ব্যাপার? আবার কি চান আপনারা?' বিরক্ত কণ্ঠস্বর। 'মিস কুমকুম হক আবার কি করলেন আপনাদের?'

বাঘের চোখে চেয়ে রইল জালাল শিকদার। ভ্রূক্ষেপও করল না মতলব আলী। রানা আশা করছিল খেপে উঠবে দারোগা। কিন্তু না। গোঁফে তা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। তালাটা ভাঙব, না তুমিই খুলে দেবে?'

'না না না। আমিই খুলে দিচ্ছি।' তালা ভাঙার কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল মতলব আলী। 'নাহ্, মহা মুশকিলেই পড়া গেল। এ রকম শুরু করলে তো চাকরীটা রাখা যাবে না আর। তিন তিনটে ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার নোটিশ দিয়েছে...' ঘর খুলে দিল সে।

ঘরটায় বাসি একটা গন্ধ। ভয়ানক গরম! হাঁ হাঁ করে উঠল মতলব আলী।

'এই দেখেন, ইলেকট্রিক হিটারটা চালিয়ে রেখে দিয়েই তিনি চলে গেছেন কোন্ জাহান্নামে কে জানে! যখন একশো টাকা বিল আসবে তখন মারমুখো হয়ে ছুটে যাবে আমার কাছে। ওয়্যারিং-এ দোষ...'

'কবে ফিরবেন আপনাকে বলে যাননি মিস হক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কোথাও যে গেছে তাই তো জানতাম না। আপনাদের কাছে শুনছি বাইরে গেছে।'

রানা লক্ষ করল, ঘরটা অগোছাল। একটা কাপে আধ খাওয়া কফি রয়েছে, একটা সাময়িক পত্রিকা খোলা পড়ে আছে সাইড টেবিলে; মনে হচ্ছে মেয়েটা ছোট্ট কোন কাজে পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে গেছে, এক্ষুণি ফিরে আসবে। বেশিদিন বাইরে থাকতে হলে মানুষ যে সব জিনিস গুছিয়ে রেখে যায় সেগুলো অগোছাল।

'আপনি ওই ঘরটা দেখুন,' কাজের কথায় এল দারোগা 'আমি এই ঘরটা দেখছি, আর মিস সোহানা রান্না ঘর, স্টোর ও গেস্টরুমটা কভার করুন।'

আদেশ অনুযায়ী বেডরুমের দিকে এগোল রানা। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল ভিড়ানো দরজাটা ভিতরটা অন্ধকার। বোঁটকা একটু গন্ধ বাতি জ্বেলেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল রানা কয়েক মুহূর্ত। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে বিছানার দিকে, রুদ্ধশ্বাসে। তারপর ডাকল ওদের।

'এদিকে আসুন দারোগা সাহেব। তুমিও এসো সোহানা। পালায়নি কুমকুম, বাড়িতেই আছে।'

ডবল বেড খাটের ঠিক মাঝখানটায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মিস কুমকুম হক। পরনে শুধু একটা সাদা পেটিকোট। রক্তে ভেজা পেটিকোট আর বিছানার চাদর খয়েরী রঙ ধারণ করেছে, শুকিয়ে কুঁচকে গেছে জায়গায় জায়গায়। বিকৃত ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা।

# পাঁচ

টেলিফোন পেয়ে ছুটাছুটি পড়ে গেল পুলিস বিভাগে। ক্যামেরা নিয়ে এসে ছবি তুলে নেয়া হলো ফিজিকাল এভিডেন্সের জন্যে। অ্যামবুলেন্স এল। পুলিস সার্জেন এল। দক্ষ, অভিজ্ঞ লোক এরা—আধ ঘন্টার মধ্যেই কাজ শেষ করে স্ট্রেচারে করে তুলে নেয়া হলো কুমকুম হকের লাশ অ্যামবুলেন্সে। প্রবীণ সার্জেন ডক্টর ইয়াকুব চিনতে পারলেন রানাকে

'কি খবর? বহুদিন পর দেখা। পাঁজরার হাড় কি ফ্র্যাকচার হয়েছিল সেবার?'*

'না। এক্সরে করে দেখা গেল কিছুই হয়নি।'

'কপাল ভাল আপনার বলতে হবে।'

'এই মেয়েটার মৃত্যুর কারণ কি বুঝলেন? খুন?' শিকদার ও সোহানা এগিয়ে এল কাছে।

'ঠিক খুন বোধহয় একে বলা যায় না।'

'তার মানে অর্ধেক খুন আর বাকিটা স্বাভাবিক মৃত্যু?' বলল রানা।

হাসলেন ডাক্তার। 'মেয়েটি মারা গেছে সার্জিকাল অ্যাবরশন, অর্থাৎ অস্ত্রোপচারে গর্ভপাতের দরুন। হেমোরেজ এবং অত্যধিক রক্তপাতে ঘটেছে মৃত্যু।'

'এই অ্যাবরশন কি নিজে নিজে করা সম্ভব?'

'না। ইউটেরাসে কিছু ঢুকিয়ে যে অ্যাবরশন করা হয় সেটা অন্যরকম। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এটা আমারই মত কোন ডাক্তারের কাজ।'

চকচক করে উঠল জালাল শিকদারের চোখ জোড়া। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারের হাতের কাজ যদি হয়, রুগীর অবস্থা খারাপ দেখে সে বুঝতে পারবে না? তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করবে না?'

'নিশ্চয়ই। যদি ডাক্তারের উপস্থিতিতে হেমোরেজের লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহলে রুগীকে বাঁচানো সহজ। কিন্তু এসব ব্যাপার যখন তখন সিরিয়াস হয়ে যেতে পারে। এই জন্যে মাইনর সার্জারি হলেও রুগীকে হাসপাতালে রাখার পক্ষপাতী আমি। যতদূর সম্ভব এটা অবৈধ গর্ভপাত। বাড়ি ফিরে ব্যথার জন্যে কোন সিডেটিভ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল মেয়েটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি গুরুতর হয়ে উঠল অবস্থা তখন কেউ ছিল না পাশে চিকিৎসার জন্যে। বড় দুঃখের বিষয়…জীবনের এমন অপচয়…'

* নীলাতঙ্ক-২ দ্রষ্টব্য

'কবে নাগাদ মারা গেছে আন্দাজ করতে পারেন?' আবার প্রশ্ন করল দারোগা।

'আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু নিশ্চয় করে বলা যায় না। সপ্তাহখানেক হবে। ছয় থেকে দশের মধ্যে যে কোন দিন ধরে নিতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। আমি ধরে নিলাম আটদিন।'

ডাক্তার চলে যেতেই সাবধান করল রানা জালাল শিকদারকে। 'বুঝতে পারছি আপনি কি ভাবছেন। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, কোন প্রমাণ নেই আপনার হাতে। কুমকুম হকের সাথে ডক্টর রুহুল আমীনকে জড়াবার মত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। যাবার সময় সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে অপরাধী।' সোহানার দিকে ফিরল রানা। 'সোহানা এবার কেসটা কিভাবে সাজালে?'

'খুবই সহজ। কুমকুমের অবৈধ প্রেমিক ছিল ডাক্তার গর্ভবতী হয়ে খুবই আপসেট হয়ে পড়েছিল সে। টের পেয়েছিল শরীফ আহমেদের মত আপন ভোলা শিল্পীও; এ নিয়ে হয়তো ঝগড়া ঝাঁটি চলছিল ওদের ভিতর। মেয়েটা হয়তো সন্তান নষ্ট করতে চায়নি, হয়তো ডাক্তার কিছুতেই কান দিচ্ছিল না। ইত্যাদি নানান ব্যাপার হতে পারে, যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করল ডাক্তার। কিন্তু গত মঙ্গলবার এসেই দেখল যে মারা গেছে মেয়েটা। ভয়ানক ভয় পেল ডাক্তার। সর্বনাশ হয়ে যাবে এ ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে গেলে। মিসেস জোনসের ওখানে বসে বসে সবদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে যখন সে বুঝল যে ওর ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই, কোন প্রমাণ ফেলে রাখেনি সে পিছনে, তখন চোরের মত বেরিয়ে এল সে বাইরে। এসেই পড়ল মাহবুবের খপ্পরে। স্বাভাবিক ভাবেই গুলিয়ে গেল ডাক্তারের মাথা। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল আতঙ্কিত ডাক্তার।'

'ভাঙা রেকর্ডের মত এক কথা বার বার বলতে বিরক্ত বোধ করছি।' বলল রানা, 'তবু বলতে হচ্ছে। পিস্তলের সমাধান কি?'

এবার জবাব দিল জালাল শিকদার।

'পিস্তল নিয়ে পরে মাথা ঘামালেও চলবে।'

'কেন? আপনি তো সেই সমস্যারই সমাধান খুঁজছেন। তাই না? নইলে উদ্ধার পাচ্ছে না মাহবুব।'

'মাহবুবের চিত্রটা অনেক বদলে যাচ্ছে—সেটা বুঝতে পারছেন না কেন? সবার ধারণা, ও একজন নিরীহ নিরপরাধ ফেরেস্তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সে হত্যা করেছে একটা জঘন্য অপরাধীকে।'

'আইনের চোখে কোন তারতম্য হবে না এর ফলে।'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল দারোগা। 'পাবলিক ওপিনিয়ন চেঞ্জ হবে। কাগজওয়ালারাই তো বাড়িয়ে তুলেছে ব্যাপারটা এতদূর। সরকার তুষ্টি ছাড়া আর কোন সাবজেক্ট পাচ্ছিল না, তাই আদা-জল খেয়ে লেগেছে মাহবুবের পিছনে। এবার আবার লাগবে ডাক্তারের পিছনে। দেখবেন।'

'তার মানে এসব কথা বলছেন আপনি সাংবাদিকদের?'
একজন কনেস্টবল মাথা ঢোকাল দরজার ফাঁক দিয়ে।
'রিপোর্টাররা অস্থির হয়ে উঠেছে, স্যার।'
'ডেকে আনো।' যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল জালাল শিকদার।
'খেয়াল রাখবেন, কোন বেফাঁস কথা আবার বেরিয়ে না যায়।' সাবধান করল রানা। তারপর বেরিয়ে গেল সোহানাকে নিয়ে। ক্লিক ক্লিক ছবি তুলে নিল কয়েকজন ফটোগ্রাফার।

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে রানা সন্ধে সাতটা। স্থান: সোহানার বাড়ির দোতলায় ধানমণ্ডী লেকের দিকে মুখ করা বারান্দা সামনে বসে আছে ধমক খাওয়া সোহানা ফ্যাকাসে মুখে। সামনের টেবিলে কয়েকটা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। এই কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছে।

কোনটার হেডিং 'ডাক্তার জেকিল এ্যান্ড মিস্টার হাইড!' কোনটায় 'বাংলাদেশের শার্লক হোমস: মাসুদ রানা।' 'কোথাও মডেলের মৃতদেহ—ডাক্তার রুহুল আমীন জড়িত?' কোনটায় আবার 'কুমকুম হকের গোপন প্রেমিক ডক্টর রুহুল আমীন?' দারোগা, কুমকুম, হক আর ডাক্তারের ছবির সাথে রানা ও সোহানারও ছবি ছাপা হয়েছে হি হি করে হাসছে সোহানা ছবিতে। তাতেই আরও রেগে গেছে রানা।

ভদ্রতার খাতিরে সম্পূর্ণ কৃতিত্বের সম্মান চাপিয়েছে জালাল শিকদার রানা ও সোহানার ঘাড়ে। একদিনেই বিখ্যাত হয়ে গেছে মাসুদ রানা ডাক্তার সম্পর্কিত চাঞ্চল্যকর তথ্য আবিষ্কার করে বাংলাদেশের শার্লক হোমস হয়ে গেছে। কোন কোন পত্রিকায় ওকে শার্লক হোমস ও জেমস বন্ডের অপূর্ব সার্থক সংমিশ্রণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সারা শহরে হুলুস্থূল। 'ভাল-মেয়ে-প্রেমে-পড়ে-বিপথে' এরকম সহানুভূতির ভঙ্গিতে মেয়েটির জীবনী ছাপা হয়েছে। অবৈধ সন্তানের জনক ডক্টর রুহুল আমীনকে বিনা দ্বিধায় সমাজের ঘৃণ্যতম কীটে পরিণত করা হয়েছে মাহবুবকে শ্রেষ্ঠ পুলিস অফিসার হিসেবে পুরস্কৃত করার দাবি তোলা হয়েছে। 'দৈনিক নির্ভেজাল' আবার কুমকুমের প্রাক্তন প্রেমিক শামসুল ইসলামকে খুঁজে বের করে তার বিবৃতি ছেপেছে। বিবৃতিতে শামসুল ইসলাম এ ব্যাপারের জন্যে সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করেছে কুমকুমের সর্বশেষ প্রেমিককে। বলেছে, কুমকুম ছিল সরল হাসিখুশি বিশ্বাসপরায়ণা ও চরিত্রবতী মেয়ে, ইত্যাদি। শিল্পী শরীফ আহমেদ সাপ্লাই করেছে সোহানার হাস্যোজ্জ্বল ছবি।

টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে শুরু করেছে রানার অফিসে। কেউ অভিনন্দন জানাচ্ছে, কেউ আরও তথ্য জানতে চাইছে, কেউ জিজ্ঞেস করছে মিস্ সোহানা চৌধুরী ওর ভাবী স্ত্রী কি না। জটিল কয়েকটা কেসের ভার রানার যোগ্য হাতে তুলে দেবার জন্যে দেখা করবার অনুমতি ও সময় চেয়ে ফোন করেছে

বারো-চোদ্দজন। ব্যস, পালিয়েছে রানা অফিস বন্ধ করে দিয়ে।

'এত করে বারণ করলাম, ঠেকাতে পারলাম না তোমাদের।' ভুরু কুঁচকে চাইল রানা সোহানার দিকে। 'ছিট আছে তোমাদের মাথায়।'

'আমি কি করলাম! ও. সি. সাহেব···'

'তুমিই ওর মাথা খারাপ করেছ। নাহ্, তোমাকে নেয়াই ভুল হয়েছিল আমার।' বিরক্ত মুখে বার কয়েক পায়চারি করে থেমে দাঁড়াল রানা। 'আমি চললাম, কাল দেখা হবে।' লম্বা পা ফেলে ঝড়ের বেগে চলে গেল রানা।

রানার বিরক্তির কারণ টের পেল সোহানা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই

ভালই লাগছিল সোহানার। ভুল হোক আর যাই হোক বিখ্যাত করে দিয়েছে সে রানাকে। বিভিন্ন ধরনের কেস নিয়ে, ভিড় করেছে পঞ্চাশ-ষাট জন রানার অফিসে। রানার অনুপস্থিতিতে সাধাসাধি শুরু করেছে সালমা কবীরকে টেলিফোনের পর টেলিফোন এসে পাগল করে তুলেছে সালমাকে। ক্ষতিটা কি হয়েছে তাতে? ওরকম মেজাজ দেখানোর কোন মানে হয় না। ভাবছিল, হয়তো খুশি ঢাকার জন্যেই মেজাজের ভান করেছিল রানা।

'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম!' রাস্তা দিয়ে হকার যাচ্ছে। আজকেও টেলিগ্রাম বের করেছে পত্রিকাগুলো। সকালের নিয়মিত সংখ্যায় বিস্তারিত বেরিয়েছে সমস্ত খবর, রানা ও সোহানার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে কাগজগুলো আরও। আবার টেলিগ্রাম কেন? 'ডাক্তারের নামে মিথ্যা প্রচার। টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম!'

ছ্যাঁৎ করে উঠল সোহানার কলজেটা। ছুটে গিয়ে ডাকল হকারকে।

ছি ছি ছি ছি! কান দুটো গরম হয়ে উঠল সোহানার। নতুন তথ্য বেরিয়েছে কাগজে। কুমকুমের লেখা কয়েকটা প্রেমপত্র থেকে জানা যাচ্ছে তার প্রেমিক ডাক্তার রুহুল আমীন নয়, নেহার মেটাল ইন্ডাস্ট্রির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার সৈয়দ আবদুল হক। ভদ্রলোক বিবাহিত। তথ্য প্রমাণের মুখে স্বীকার গেছে, কিন্তু বলেছে, গর্ভপাত সম্পর্কে কিছুই জানে না সে। সমস্ত ব্যাপারটা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা হয়েছে খবরে। প্রথমেই লিখেছে ডাক্তার রুহুল আমীনের পক্ষে অবৈধ সন্তানের জনক হওয়া সম্ভবই ছিল না। কারণ কয়েক বছর আগে শিকারে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় একটা পয়েন্ট টু টু বুলেট ডাক্তারের তলপেটে ঢুকে কিডনী ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারের ফলে একটা কিডনী ও পাকস্থলীর বেশ কিছুটা অংশই কেবল নষ্ট হয়ে যায়নি, সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যায় ডাক্তারের। উপযুক্ত প্রমাণ আছে। কাজেই সন্তানটি ডাক্তারের নয়। এর পরেই প্রেম পত্রের অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে, সেই সাথে সৈয়দ আবদুল হকের স্বীকৃতি। তারপর লিখেছে ডাক্তার রুহুল আমীন যে অবৈধ গর্ভপাতের ব্যাপারেও জড়িত ছিলেন না সেটা প্রমাণিত হয়েছে নকল এম. আর. সি. ও. জি. ডিগ্রিধারী এক গাইনোকলজিস্ট ধরা পড়ায়। সব কথা স্বীকার গেছে নকল ডাক্তার।

এরপর মনের সুখে ধোলাই করা হয়েছে শখের গোয়েন্দা মাসুদ রানা ও তার সহকারিণী মিস সোহানা চৌধুরীকে। পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল সোহানার। বার বার চোখে রুমাল চেপেও কিছুই হচ্ছে না—ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে সোহানার। এমন নির্মম সমালোচনা ও তির্যক বক্রোক্তির সম্মুখীন হয়নি সে জীবনে।

সবশেষে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে পূর্ব প্রকাশিত ভুল খবর ছাপার জন্যে। একজন সুবিখ্যাত ও সম্মানিত নাগরিকের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারও নেই। সাব-ইন্সপেক্টর মাহবুবুল আলমকে রক্ষা করতে গিয়ে তার নিয়োজিত গোয়েন্দা সমস্ত দোষ ডাক্তার রুহুল আমীনের ঘাড়ে চাপাবার যে গর্হিত প্রয়াস পেয়েছেন সেটা নিন্দা করবার ভাষা আমাদের জানা নেই। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কাঁধের ওপর হাত রাখল কেউ। চমকে চেয়ে দেখল সোহানা মিটিমিটি হাসছে রানা। প্রথমেই চট্ করে চোখের পানি লুকোবার জন্যে মাথা সরিয়ে নিল সোহানা, পর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার প্রশস্ত বুকে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে সে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে সোহানা' কেঁদো না। ছি ছেলেমানুষ নাকি তুমি!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। রানার শার্ট ভিজে একাকার। মিনিট পাঁচেক কেঁদে অনেকটা হালকা হয়ে ত্রস্তপদে চলে গেল বাথরুমে, চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে ফিরে এল লজ্জিত মুখে।

'তোমার মুখে চুনকালি মাখিয়ে ছেড়ে দিলাম আমি।' বলল সোহানা। 'খুব রাগ করেছ, না? যদি জানতাম…'

'তাহলে ও পথ মাড়াতে না, এই তো? কিন্তু জেনে রাখো, আসল ভুলটা তুমি করোনি, করেছে জালাল শিকদার। তুমি যেটুকু ভুল করেছ সেই ভুলে আমার অনেক উপকার হয়েছে আসলে। অনেক কিছু জানতে পেরেছি আমি।'

'উপকার হয়েছে!' অবাক হয়ে চাইল সোহানা রানার মুখের দিকে।

'হ্যাঁ। প্রথম উপকার, ডাক্তারের সুনাম রক্ষার উদ্দেশ্যে কারা কাজ করছে জানতে পেরেছি আমি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এত চমৎকার দক্ষতার সাথে এত সব তথ্য কারা খুঁজে বের করল জেনেছি। অন্তর্নিহিত কারণ, অর্থাৎ কেন ওরা এত কষ্ট স্বীকার করতে গেল, জানতে পারিনি, কিন্তু জানব শীঘ্রি। দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে, তোমার চিন্তার লাইনটা মোটামুটি অনুসরণ করে আমার মাথায় কয়েকটা নতুন আইডিয়া খেলতে শুরু করেছে। তৃতীয় উপকার, ক্লায়েন্টগুলোর হাত থেকে রক্ষা পাব এবার। ভাগবে সব চতুর্থ, এবং এটাই আসল উপকার, ভেউ ভেউ করে কাঁদলে যে তোমাকে এত অপূর্ব সুন্দর দেখায় সে কথা জানা ছিল না আমার, জেনে নিলাম এই সুযোগে।'

'যাহ্ পাজী কোথাকার। শেষেরটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, আর আগের তিনটে মিথ্যে সান্ত্বনা।'

'না, সত্যি। খোদার কসম।'

'তাহলে এখনও কাজে বহাল আছি আমি?'

'আছ। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার দুই কাপ চায়ের অর্ডার দেয়া। দ্বিতীয় কাজ, বিস্কিটের টিন খুলে গোটাকতক ভাল জাতের বিস্কিট নিয়ে আসা। তৃতীয় কাজ, ঠিক দশ মিনিট পর একটা চুমু খেয়ে আমাকে বিদায় দেয়া।'

'অসভ্য! জানোয়ার।' চলে গেল সোহানা চায়ের কথা বলতে। হালকা হয়ে গেছে মনটা।

একটা ল্যাম্প পোস্টের আলো ঝিলমিল করছে লেকের পানিতে। সুন্দর একটা ঠাণ্ডা হাওয়া উঠেছে সন্ধে হতেই। মীরপুর রোডে ব্যস্ত ট্রাফিক। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা।

# ছয়

জেড্ এ্যান্ড জেড্। ফাইন্যান্শিয়াল কন্সালট্যান্টস। দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়ার চারতলা এক অফিস বিল্ডিং-এর সম্পূর্ণ তৃতল জুড়ে বিরাট অফিস। ওয়েটিং রুমে রানাকে বসিয়ে কার্ড নিয়ে ঢুকল সুন্দরী রিসেপশনিস্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টার খসরুজ্জামানের কামরায়। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এসে ডাক দিল রানাকে।

'বসুন।' কিছু লিখছিল, মাথা না তুলেই বসতে বলল খসরুজ্জামান রানাকে।

পরিচ্ছন্ন আধুনিক রুচির পরিচয় কামরার সর্বত্র। পুরু কার্পেট। দামী আসবাব। দামী স্যুট খসরুজ্জামানের পরনে। গোল্ড ফ্রেমের চশমা। জুলফির কাছে কয়েকটা পাকা চুল আভিজাত্য বাড়িয়েছে। চমৎকার আকর্ষণীয় চেহারা। বয়সটা আন্দাজ করল রানা, বেয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ।

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি, মিস্টার মাসুদ রানা?' রানার চোখে চোখ রাখল ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।

'আপনাদের এক ক্লায়েন্ট ডক্টর রুহুল আমীনের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ইনস্যুরেন্স ক্লেইমের ব্যাপারটা সেটল্ করার জন্যেই এই এনকয়েরি। আপনারাই তো ডাক্তারের সমস্ত অ্যাকাউন্টস হ্যান্ডল করতেন?'

রানার ইঙ্গিতটা টের পেল খসরুজ্জামান। ভ্রূ জোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হলো রানা একবার ভাবল গোড়াতেই মিথ্যা কথা দিয়ে শুরু করাটা ঠিক হলো কিনা। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যাও নয় গত পরশু জালাল শিকদারের দৌলতে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পর ঈস্ট এশিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে রানাকে এ ব্যাপারে তদন্তের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। রানাও গররাজি ছিল না। কিন্তু গত সন্ধ্যায় নতুন তথ্যের দাপটে রানার খ্যাতি হাওয়ায় মিলিয়ে

যেতেই তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। আ■দিকালে সরাসরি নিষেধই করে দিয়েছে, রানা যেন এসব ব্যাপারে নাক না গলায়। কিন্তু এই ঘুঘু লোকের কাছ থেকে কোন কথা বের করতে হলে বড় কোন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এসেছে এমন ভাব না দেখিয়ে উপায় ছিল না।

'আপনি ইস্ট এশিয়া ইনস্যুরেন্স থেকে এসেছেন?' সরাসরি প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। তারাই আমাকে নিয়োগ করেছে।'

'ঠিক কি জানতে চান আপনি?'

'ডক্টর রুহুল আমীনের ফাইন্যানশিয়াল স্ট্যাটাস সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দরকার টাকা পেমেন্টের আগে। অনেকগুলো টাকা। যদি উনি ওভার ইনশিওরড্ হয়ে থাকেন, যদি ওঁর আর্থিক অবস্থা আর ইনস্যুরেন্সের রেশিও গোলমেলে থাকে, তাহলে ঠকবাজি, ইত্যাদি নানারকম সন্দেহের অবকাশ আসে।'

'ডক্টর আমীনের আর্থিক সমস্ত বিষয় আমরা তদারক করতাম। কাজেই ইনস্যুরেন্সের ব্যাপারটাও আমাদেরই এক্তিয়ারে ছিল। যতদূর মনে পড়ছে, এসব প্রশ্ন উঠেছিল এবং এর নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল কয়েক বছর আগেই, পলিসি রিভাইভ করার সময়। কাজেই...'

'কিছু মনে করবেন না, আমি আদেশ পালন করছি মাত্র। গত তিন বছর ডক্টর আমীন কোথা থেকে কিভাবে কত টাকা উপার্জন করেছেন তার একটা রিপোর্ট আমার দরকার। ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নটাও লাগবে।'

মৃদু হাসল খসরুজ্জামান। চমৎকার দুই পাটি ঝকঝকে সাদা দাঁত।

'আপনার কথাগুলো হুকুমের মত শোনাচ্ছে। ধরুন, যদি আপনার আদেশ অমান্য করি, কি শাস্তি আমার জন্যে?'

'ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়বেন। কোর্টে যাবে কেসটা। নানান ঝামেলা হবে! তার চেয়ে সহযোগিতা করাই কি ভাল নয়?'

'না, ঝামেলা আমার খুব প্রিয় জিনিস। ঝামেলা ছাড়া জীবন অর্থহীন।'

'আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি খুব বিপজ্জনক জীবন যাপন করেন।'

'সবাই তাই করে। দুনিয়াটা ভয়ানক বিপজ্জনক জায়গা। প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে না কেউ এখান থেকে। কাজেই এড়িয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা না করে বিপদের মুখোমুখি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোই ভাল।' আবার হাসল খসরুজ্জামান। 'এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত দর্শন।'

'ডক্টর আমীন আপনার উপযুক্ত সার্থক শিষ্য।'

মিলিয়ে গেল হাসিটা। 'এ কথা বলছেন কেন?'

'তিনিও জুয়া এবং শেয়ার মার্কেটে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়ে প্রচুর উপার্জন করেছেন মাত্র তিন বছরে। কিংবা আপনি তাঁর হয়ে করে দিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর ওপর ভাগ্য দেবীর এতটা প্রসন্ন হয়ে ওঠার কারণ বুঝতে পারছি না।'

'আপনি খুব অনুসন্ধিৎসু লোক, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'যাই হোক, ডক্টর আমীনের উপার্জনের রিপোর্টটা কখন পাচ্ছি?'

'ওটা পাচ্ছেন না।'

'এর ফলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন।'

উত্তর না দিয়ে রিসিভার তুলে নিল খসরুজ্জামান। ডায়াল করল দ্রুত।

ঈস্ট এশিয়া ইনস্যুরেন্স?···ম্যানেজিং ডাইরেক্টার আল্লা বকশকে দিন।···আমি খসরুজ্জামান।···কিহে, তুমি না বললে গোয়েন্দাটাকে বারণ করে দিয়েছ?;···এই তো বসে আছে।···কি বললে?···সেক্ষেত্রে কান ধরে বের করে দেব, অথবা পুলিসে দেব।···তোমার বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই···ঠিক আছে দেখা হবে সন্ধ্যায়, ক্লাবে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানার দিকে ফিরল খসরুজ্জামান। 'কোন্‌টা চান?'

'এই দুটো ছাড়া আর কোন চয়েসের সুযোগ নেই?' মুচকি হাসল রানা।

'আছে। সেটা হচ্ছে সোজা এখান থেকে বেরিয়ে দূর হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়বার মিথ্যা পরিচয়ে আমার অফিসে ঢুকলে কপালে দুটোই জুটবে এক সাথে।'

'আপনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন মিথ্যে বলছি। এতক্ষণ না বোঝার ভান করেছিলেন কেন?'

'কৌতূহল। আপনাকে ওজন করে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। আমার কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে। আপনি এবার আসতে পারেন।'

'কিছু শেয়ার কিনতে পারি আমি, আপনি বললে আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটে জুয়াও খেলতে পারি। দিন না আমাকে ডক্টর আমীনের মত বড় লোক বানিয়ে।'

'ডক্টর আমীনকে কিভাবে আমরা বড়লোক বানিয়েছি বলে আপনার ধারণা?' ছোট হয়ে গেল চোখ দুটো।

'আমার ধারণা আমার কাছেই থাকুক। কিন্তু তিন বছরে ছেঁড়া কাঁথা থেকে একেবারে মিলিওনেয়ার! দিন না আমাকেও বানিয়ে?'

'সাবধান, মিস্টার মাসুদ রানা! ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন আপনি। এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন ডক্টর রুহুল আমীনের মতই জেড এ্যান্ড জেডের সম্মান সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা অভিযোগ এনে লাভ হবে না কিছুই। প্রমাণ কৈ আপনার?' হঠাৎ কাজে মন দিল খসরুজ্জামান। 'নাউ, প্লীজ গেট আউট।'

বেরিয়ে এল রানা ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কামরা থেকে। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাজ করছে অফিসের পঞ্চাশ-ষাটজন বিভিন্ন পদের কর্মচারী। মোটা মোটা জার্নাল আর লেজার খুলে বসে আছে কয়েকজন, ইলেকট্রিক ক্যালকুলেটারের বোতামে আঙুল চলছে অনায়াস দক্ষতায়।

চলে আসছিল রানা, হঠাৎ লাস ভেগাস নামটা কানে আসতেই থমকে দাঁড়াল। সুন্দরী রিসেপশনিস্ট কথা বলছে টেলিফোন অপারেটারের সাথে। ট্রাংকল বুক করছে সে।

লাস ভেগাস! আমেরিকার জুয়ার শহর। অপরাধ জগতের স্বর্গ। পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম দস্যুদল মাফিয়ার রাজধানী। হেন বেআইনী কাজ নেই যা সেখানে সংঘটিত হয় না। সেখানে কার সাথে কথা বলতে চায় সম্মানিত প্রতিষ্ঠান জেড এ্যান্ড জেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার খসরুজ্জামান চৌধুরী? কেন? রিপোর্ট করছে? নির্দেশ চাইছে? বিপদ সঙ্কেত পাঠাচ্ছে?

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা। ছেড়ে দিল গাড়ি। কিছুদূর গিয়েই আবার সেই সন্দেহটা জাগল রানার মনে। মনে হলো অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। একটা মোড়ে গাড়ি থামাল সে সিগারেট কেনার ভান করে। সাদা ফোক্স ওয়াগেনটা চলে গেল, থামল না। চারজন আরোহী। কেউ চাইল না রানার দিকে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। আর দেখা গেল না গাড়িটা।

# সাত

রাত সাড়ে আটটার দিকে বায়তুল মোকাররমে গিয়ে হাজির হলো রানা। শনিবার। ওষুধের দোকান ছাড়া সব দোকান বন্ধ। জি. পি.ও-র সামনে না নেমে ঘুরে এসে মসজিদের পিছন দিকে রাদুর সামনে গাড়ি পার্ক করল সে। এদিকটা অন্ধকার। কয়েকটা কুকুর শুয়ে আছে দোকানের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

নিচের কয়েকটা ওষুধের দোকানে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেল। মাহবুবের কথাই ঠিক। জানা গেল, খুব ভাল প্র্যাকটিস ছিল না ডাক্তারের। স্পেশালিস্টদের কাছে আসলে ভিড় করে রোগী। জেনারেল প্র্যাকটিশনারদের উপার্জন সাধারণত আসে ইমার্জেন্সী কল থেকে। কিন্তু ইমার্জেন্সী কল এড়িয়ে চলত ডাক্তার।

দোতলায় উঠে এল রানা। করিডরটা আবছা অন্ধকার। এমনিতেই দোতলায় বিশেষ লোকজনের চলাচল নেই, তার ওপর আজ শনিবার বলে প্রায় জনশূন্য। বেশির ভাগই সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট বা ওই ধরনের হোলসেল দোকান, কিছু ইন্ডেন্টারের অফিস—সব বন্ধ। কয়েকজন ডাক্তারের চেম্বার আছে বাম ধারে, সেখানে কিছু লোকের আনাগোনা আছে, এদিকটা প্রায় জনশূন্য।

ডক্টর রুহুল আমীনের দরজাটা খোলা দেখে একটু অবাক হলো রানা। আর কেউ ভাড়া নিল নাকি চেম্বারটা? ঢুকে পড়ল রানা ভিতরে। পর্দা সরিয়ে দেখা গেল রোগীদের বসবার জন্যে সোফা পাতা আছে। পর্দার ওপাশে সেক্রেটারি বা নার্সের জন্যে একটা ডেস্ক। ছোট্ট একটা নেম প্লেট—অলোকা সেন। কেউ নেই সে ঘরে। এর পরে চেম্বার। টেবিলের উপর ডক্টর রুহুল আমীনের প্লাস্টিক নেম প্লেট। পাশের একটা ঘরে রোগী পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা। সেই ঘরে খুট খাট শব্দ হচ্ছে। রানার সাড়া পেয়ে মেয়েলী কণ্ঠে কেউ বলল, 'একটু বসুন, আমি আসছি এক্ষুণি।'

ডাক্তারের চেম্বারটা লক্ষ করল রানা ঘুরে ফিরে। সুন্দর করে সাজানো। নানান ধরনের কারুকাজ করা দেশী খেলনা রয়েছে বেশ কয়েকটা, নক্সা আঁকা কুলো, মাটির পাত্র দেয়ালে টাঙানো। গ্রাম্য হস্তশিল্পের নমুনা। তবু ভুল হয় না যে এটা ডাক্তারের চেম্বার।

একজন নার্স বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে। গায়ের রঙ শ্যামলা, কিন্তু দেখতে ভাল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে। বুদ্ধি দীপ্ত দুই চোখ। অ্যান্টি সেপটিক ইউনিফরমে মানিয়েছে চমৎকার!

'এই যে রহিম সাহেব, স্টক রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছি আপনার জন্যে।' একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল মেয়েটা রানার দিকে। 'এটা নিয়ে যেতে পারেন, ডুপ্লিকেট কপি আছে আমার কাছে। কিংবা এখানে বসেও দেখতে পারেন, যদি চান।'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল রানা। দ্রুত চোখ বুলাল একবার। টেবিল, চেয়ার, খাটিয়া, সিরিঞ্জ, ওষুধ আর যন্ত্রপাতির লিস্ট। খুব সম্ভব অন্য কোন ডাক্তারের কাছে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে জিনিসপত্র।

'কিন্তু আপনার নামটা দেখছি না যে এর মধ্যে?' মিষ্টি করে হাসল রানা।

'কারণ আমি বিক্রয় যোগ্য পণ্য নই।' হাসল অলোকাও।

'তাহলে আমি এর মধ্যে নেই।' যেন দারুণ হতাশ হয়েছে এমনি ভাবে কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দিল রানা।

'ব্যঙ্গ না সর্প—কিভাবে ধরব কথাটা?'

'আগে পরিচয়ের পালাটা চুকিয়ে নেয়া যাক। আপনি ভুল করেছেন। আমার নাম রহিম সাহেব নয়। আমি অন্য কাজে এসেছি। অবশ্য আপনার কাছেই। আমার নাম মাসুদ রানা। কয়েকটা কথা জানতে চাই আমি।'

'মাসুদ রানা ' একটু যেন থমকে গেল অলোকা। যেন কোথায় শুনেছে নামটা। পর মুহূর্তে মনে পড়ল। 'আপনি সেই লোকটা। খুনির সমর্থনে যা-তা বলে বেড়াচ্ছেন ডাক্তার সাহেবের নামে। কি চান আপনি আমার কাছে?'

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর।'

'আশ্চর্য! কোন্ সাহসে আপনি আমার কাছে এসেছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি দুঃখিত। আপনাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছি না। আপনি আসুন।'

'এই তো এসেছি। একটা চিঠিও এনেছি সাথে। আমাকে দেখে আপনার এ ধরনের মনোভাব হতে পারে আঁচ করে সলীল সেনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'দাদা? ওকালতি করছে আপনার হয়ে? দেখি চিঠি?'

প্রথমেই সইটা পরীক্ষা করে দেখল অলোকা, তারপর পড়ল চিঠি। দু'একটা পারিবারিক সাঙ্কেতিক শব্দে মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। চিঠি শেষ করে সোজা চাইল

রানার চোখে।

'হ্যাঁ, এটা দাদারই চিঠি। বসুন। উফ্ আপনি মস্ত বাঁচা বাঁচালেন আমাকে। এক বছর পর খবর পেলাম দাদার। ভাল আছে তো? যুদ্ধে কোন···'

'পায়ে গুলি খেয়েছিল। সেরে গেছে। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কাজে যোগ দিয়েছে।'

হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল অলোকা।

'তা আপনি দাদার বন্ধু হয়ে অন্যায়ের সমর্থনে কাজ করছেন কেন?'

'কাজটা অন্যায় মনে করছি না বলেই।' মাথা নেড়ে অলোকাকে আপত্তি জানাতে দেখে চট্ করে যোগ করল, 'এ নিয়ে আপনার সাথে তর্ক না করাই ভাল। আপনি ডক্টর রুহুল আমীনকে অনেক কাছে থেকে অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন, কাজেই অনেক কিছুই আপনার চোখে পড়ছে না। দূর থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে এতটা ভক্তি হয়তো থাকত না, এবং কেন উনি সন্দেহজনক ভাবে দৌড় দিলেন, এবং কেন দায়িত্বশীল একজন পুলিস অফিসার বাধ্য···'

'দায়িত্বশীল! একজন হত্যাকারীকে আপনি দায়িত্বশীল অফিসার বলছেন? নিরীহ ভাল মানুষটাকে খুন করেন আপনারা, তারওপর তার নামে কুৎসা রটনা করলেন একটা বাজে মেয়েলোকের সাথে জড়িয়ে। এ সব কাজকে আবার জাস্টিফাই করার কি আছে? চার বছর ধরে কাজ করছি আমি এখানে, আমি তাঁকে চিনি না, দূর থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেই চিনে ফেললেন আপনারা তাঁকে একটা চরিত্রহীন লোক হিসেবে?

রানা বুঝল এ রকম আলোচনায় ফল হবে না। কৌশলের আশ্রয় নিল।

'ঠিক আছে: ধরা যাক, আমি আর আপনি দুই পক্ষের উকিল। তর্ক যখন করতে চান, তর্কই করা যাক। আপনি ডাক্তারের পক্ষ নিয়ে আমার অভিযোগ খণ্ডন করুন। রাজী?'

'রাজী।'

'ডাক্তারের ব্যক্তিগত চরিত্রের ব্যাপারে আপনার মত আমি সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু টাকা? এত টাকা পেলেন কোথায় ডাক্তার এত অল্প সময়ে? এ ব্যাপারে সদুত্তর দিতে পারবেন আপনি?'

'পারব। চার বছর আগে দুশো টাকা বেতনে কাজে ঢুকেছিলাম আমি। এখন আমার বেতন সাড়ে পাঁচশো। এক বছর পরই আমার বেতন ডবল হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি জানি ডাক্তার সাহেবের প্র্যাকটিস আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। তাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে এ ব্যাপারে। শেয়ার মার্কেটে স্পেকুলেশন করে টাকা করেছেন উনি। প্রতি পনেরো দিন অন্তর বিরাট সব অঙ্কের চেক আসে জেড এ্যান্ড জেড, ফাইন্যানশিয়াল কনসালট্যান্টসের কাছ থেকে, আমি নিজে হাতে জমা দিয়েছি সে সব চেক। শেয়ার মার্কেটে কপাল খুলে যাওয়া তো সাধারণ ব্যাপার, তাই না?'

রানা জানে পনেরো দিন অন্তর নিয়মিত শেয়ার মার্কেটের স্পেকুলেশনের টাকা আসতে পারে না। কিন্তু সে কথা বলল না। প্রবল যুক্তির মুখে যেন অনেকটা দুর্বল হয়ে এসেছে, এমনি ভাবে বলল, 'আমার ধারণা ছিল বার্মার বর্ডারে তিরমিজ দ্বীপে চিকিৎসা করেই এত টাকা করেছেন ডাক্তার। তিন বছর আগেই প্রথম সেখানে গিয়েছিলেন উনি?'

হেসে ফেলল অলোকা। 'মাথা খারাপ আপনার। আপনি হয়তো জানেন না, একটা পয়সা দেয়ারও ক্ষমতা নেই ওই দ্বীপের অর্ধ উলঙ্গ লোকগুলোর। এই দেখুন, আঙুল তুলে হস্তশিল্পের নমুনাগুলো দেখাল সে, 'ওদের ভিজিটের নমুনা। ওই যে পাটি, নক্সা করা পাখা, নারকেল খোলার পুতুল, কুলো, বেতের ঝুড়ি—এখানে, এই শহরে কয় পয়সা দাম ওগুলোর? কিন্তু এ সব ছাড়া ওরা দেবেই বা কি? ভালবাসার নিদর্শন ফিরিয়ে দিতেন না ডাক্তার সাহেব, নিয়ে আসতেন ঢাকায়, বেশ কিছু জমা হয়ে গেলে দান করে দিতেন একে ওকে। ওই দেখুন ঘরের কোণে জমে আছে একরাশ।' মাথা নাড়ল অলোকা। 'ভুল পথে ভাবছেন আপনি, মাসুদ সাহেব। আসলে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার তিরমিজ দ্বীপে যেতে প্রচুর পয়সা খরচ হত ডাক্তার সাহেবের। বিনিময়ে পেতেন না তিনি কিছুই। পাওয়ার আশাও করতেন না। অ্যামফিবিয়ান প্লেন চার্টার করে মাসে দু'বার করে তিরমিজ দ্বীপে যাওয়া যথেষ্ট খরচের ব্যাপার। সেই সাথে প্রচুর পরিমাণে জামা কাপড় আর ওষুধ নিয়ে যেতেন উনি ওদের মধ্যে বিনা পয়সায় বিতরণের জন্যে। এ ছাড়া গত তিন বছরে (বারো দুগুণে চব্বিশ, আর তিন চব্বিশং) বাহাত্তর দিন অনুপস্থিত থাকায় কত রুগীকে যে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে সে আমিই জানি। সব টাকা যদি যোগ দেন, দেখবেন গরীব মানুষের জন্যে সব টাকা ব্যয় করেছেন তিনি।'

'আমি মনে করেছিলাম ওটা শখের ব্যাপার। নিজের পয়সা নষ্ট করে এবং এত টাকার ক্ষতি স্বীকার করে যে উনি কতগুলো জংলী লোকের উপকার করতেন...নাহ্,...শ্রদ্ধাই এসে যাচ্ছে ওঁর ওপর।'

বিজয়িনীর মত হাসল অলোকা সেন। 'এমন কি আবহাওয়ার দরুন যদি কোন সোমবার যেতে না পারতেন পরদিন যেতেই হবে ওঁকে। কারও কোন কথা শুনবেন না। ওঁর ওই এক কথা, আশা করে পথ চেয়ে বসে আছে ওরা।'

'জংলীদের প্রতি এত প্রেম ওঁর স্ত্রী কিভাবে গ্রহণ করতেন?

'ওহ্, ওঁর কথা বলবেন না। ডাক্তার সাহেবের জীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিলেন ওঁর গিন্নী। ছেলেটাও হয়েছে একটা উচ্ছন্নে যাওয়া অমানুষ। আমার মনে হয় পারিবারিক অশান্তির কথা ভুলবার জন্যেই উনি বেছে নিয়েছিলেন সহজ, সরল, জংলী লোকগুলোর সঙ্গ। ওই যে দেখছেন কাপড়ের পোঁটলা, কিছু নিজে কিনতেন, আর কিছু সংগ্রহ করতেন বন্ধু-বান্ধবের কাছে চেয়ে চিন্তে—সব ওই জংলীদের জন্যে।'

টেলিফোন এল। রহিম সাহেব জানাল যে আজ আর আসতে পারবে না।

কাল আসবে। ■।

'জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। ডাক্তার গিন্নীর অনুরোধে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমিই। কাল ছাড়া পাব। হপ্তাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরোব চাকরির খোঁজে।'

'নার্সের চাকরি তো প্রচুর খালি আছে শুনেছি।'

'আছে; কিন্তু এত বেতনের চাকরি পাওয়া মুশকিল।'

'আপনার খরিদ্দার তো আসছে না. চলুন তাহলে পৌঁছে দিই আপনাকে বাসায়?'

'না, অনেক ধন্যবাদ। আরও কিছু কাজ আছে. আধ ঘন্টা পর যাব।'

বেরিয়ে এল রানা বাইরে। গাড়িটা পিছন দিকে পার্ক করা। লম্বা পা ফেলে এগোল রানা। কয়েকটা আপাত বিরোধী চিন্তা ঘুরছে ওর মাথায়। ডাক্তারের কথাই ভাবছে। একজন লোক একদিকে পাক্কা জুয়াড়ী, অন্যদিকে পরোপকারী; একদিকে চরম অসুখী, সাংসারিক জীবনে স্ত্রী পুত্রকে সুখী করতে পারেনি, অন্যদিকে কোথাকার কোন্ এক জংলী দ্বীপে উজাড় করে দিয়েছে তার সমস্ত ভালবাসা; একদিকে দুই হাতে উড়াবার মত টাকা আছে তার, অন্যদিকে পেশাগত উপার্জন মাঝারি। অসঙ্গতি সবার মধ্যেই আছে, কিন্তু ডক্টর রুহুল আমীনকে এ ব্যাপারে ওয়ার্লড চাম্পিয়ান বলে মনে হচ্ছে।

গাড়ির কাছে এসেই মনটা খারাপ হয়ে গেল রানার। হেলে আছে একদিকে পাংচার হয়ে গেছে একটা চাকা। বুট খুলে বের করল সে স্পেয়ার চাকাটা।

'টেরাবোল হোয়া গেল লাগে?'

খুব কাছে পিছনে থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। ঝট্ করে পিছন ফিরল রানা। চারজন লোক। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে ওকে অর্ধচন্দ্রাকারে। চিনতে পারল রানা। সেই চারজন। সাদা ফোক্সওয়াগেনের সেই অনুসরণকারীরা।

# আট

একটা ছোট্ট অ্যামফিবিয়ান উড়ছে আকাশে। শুয়ে আছে রানা নিজের বিছানায়। প্রপেলারের গোঁ গোঁ শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা জানালা দিয়ে। ঘাড়ের কয়েকটা পেশী তীব্র আপত্তি জানাল। সারা শরীরে যে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশী আছে জানা ছিল না ওর আগে। উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি সে এদের। রানার দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে এখন সব কটা পেশী একসাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে ওর।

বেলা নয়টা! আধ ঘন্টা আগেই ঘুম ভেঙেছে রানার, কিন্তু উঠতে সাহস হচ্ছে

না। আধঘন্টা ধরে প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটু আধটু নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করছে সে। কেটে বা ছড়ে গেছে কয়েক জায়গা, কিন্তু হাড় যে ভাঙেনি একটাও তাতেই খুশিতে লাফাতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু পারছে না।

প্লেনটা দেখে হঠাৎ মনে পড়ল রানার, আজ রোববার। আগামীকাল এ মাসের প্রথম সোমবার। অর্থাৎ ডক্টর রুহুল আমীনের তিরমিজ দ্বীপে যাওয়ার তারিখ। দ্বীপবাসীরা জানেও না যে মারা গেছে ওদের প্রিয় ডাক্তার। ওরা হয়তো কাল শিশুর মত অবুঝ আশায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। শিশুর কথা ভাবতেই মিসেস জোনসের কথা মনে পড়ল। ভুরু কুঁচকে গেল রানার। সোমবার যেত ডাক্তার তিরমিজে, মঙ্গলবার যেত মিসেস জোন্সের কাছে। বাঁধা নিয়ম। ডাক্তারের রহস্যময় অনিয়মিত জীবনে এই দুটো নিয়ম বাঁধা। কোন সম্পর্ক আছে এ দুটোর মধ্যে?

তড়াক করে উঠে বসল রানা। হাউ মাউ করে একসাথে আপত্তি জানাল সর্বাঙ্গের সব কটা দুর্ব্যবহারপ্রাপ্ত পেশী। চোখ বন্ধ করে ঝিম ধরে বসে রইল সে আধ মিনিট। তারপর অতি সাবধানে যেন একটি পেশীও টের না পায় এমন ভাবে হাত বাড়াল ব্র্যান্ডির বোতলটার দিকে। আউন্স চারেক ঢালল একটা গ্লাসে। এবার সমপরিমাণ সাবধানে ড্রয়ার থেকে গোটাচারেক ডিসপ্রিন বের করল। একেকটা ডিসপ্রিন নেমে গেল একেক ঢোক ব্র্যান্ডির সাথে সাথে। গলার কাছে মিষ্টি একটা জ্বালা অনুভব করল রানা অ্যালকোহলের।

নাস্তার জন্যে বেল টিপে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। শেভ করে, দাঁত মাজতে মাজতেই অনুভব করল কমে যাচ্ছে শরীরের ব্যথাটা। উৎসাহিত হয়ে গোসলটাও সেরে নিল সে এই সাথে। চাঙ্গা হয়ে বেরিয়ে এল সে বাথরুম থেকে।

গাড়ির বনেটের উপর ওকে ঠেসে ধরে মনের সুখে মেরেছে ওরা কাল। চারজনের বিরুদ্ধে একজন হওয়ায় ও মেরেছে চার ভাগের একভাগ। জ্ঞান হারাবার আগে টের পেয়েছিল রানা সার্চ করা হচ্ছে ওকে। একজন বলল, 'নেই কিছু।' আরেকটা লাথি পড়ল পাঁজরে। আরেকজন বলল, 'হয়েছে থাক, এতেই তিনদিন বিছানায় শুয়ে থাকবে টিকটিকির বাচ্চা।' আপত্তি করল আরেকজন, 'হয়েছে থাক, মানে? নাকটা ভেঙে দিয়েছে শালা আমার।' আরেকটা লাথি পড়ল। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারাল রানা।

ঘন্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরতেই দেখল সে কালো মত কি যেন ওর মুখের কাছে। একটু নড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে সরে গেল। কুকুর। আশেপাশে জন মানুষের চিহ্ন নেই। উঠে দাঁড়াল সে টলতে টলতে। বহু কষ্টে, এক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর চাকাটা বদলে গাড়িতে উঠল। রক্তে ভেজা ছেঁড়া শার্টের বুক পকেটে পিন দিয়ে আঁটা এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা: সরে দাঁড়াও মাসুদ রানা। এখনও সময় আছে। এতে যদি শিক্ষা না হয়ে থাকে, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থেকো। আগামী বার হত্যা করার জন্যে মারা হবে, শিক্ষা দেয়ার জন্যে নয়।

পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে ফার্স্ট এইড নিয়ে বাসায় ফিরে ঘুম দিয়েছে রানা।

নাস্তা সাজিয়ে দিয়ে গেছে রাঙার মা। খেয়ে নিল রানা চটপট, তারপর বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। সাত মিনিট পর হাজির হলো সে নিউ সার্কুলার রোডের তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে। মিসেস জোন্সের ওখানে ডক্টর রুহুল আমীন প্রত্যেক মঙ্গলবার যেত, নাকি মাসের প্রথম ও তৃতীয় মঙ্গলবার যেত জানতে হবে ওর। যদি পরেরটা হয়, তাহলে এই সূত্র ধরে এগোনো যাবে। বিপদে পড়তে চেয়েছিল সে, বিপদে পড়েছে। অর্থাৎ ঠিক পথেই চলেছে ও। এবার বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হবে। সময় নেই হাতে, ঘনিয়ে এসেছে মাহবুবের বিচারের দিন।

অনেকক্ষণ বেল টিপেও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বুড়ির। মরল নাকি? গেল কোথায়?

কি করবে ভাবছে রানা, এমন সময় পাইলটের দরজাটা খুলে গেল। তোয়ালেটা কাঁধে, খালি গা, ছোট্ট একটা সুইমিং কস্টিউম পরনে, পায়ে স্লিপার! রানাকে দেখে এক গাল হাসল। 'আবার এসেছেন? এবার ওই বুড়িকে আর আমাকে নিয়ে একটা গল্প ফাঁদবেন বলে মনে হচ্ছে? হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এল পাইলট কামরুজ্জামান। কপালে তুলল দুই চোখ। 'ইয়া আল্লা! ছেলেটাকে মারল কে এভাবে?'

'খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম।' বলল রানা।

'মিসেস জোনস গেল কোথায় বলতে পারেন?'

'উহুঁ। কিচ্ছু জানি না। কুমকুম হকের ব্যাপারটা জানতে পেরে প্রতিবেশিনীদের সম্পর্কে সব আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে আমার। আমি তো প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম, হয়তো বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে বসতে পারতাম—তার যে এত কাণ্ডকীর্তি! ওরেব্বাপ! কি ভুল যে করতে যাচ্ছিলাম! এখনও আঁতকে উঠি আমি ঘুমের ঘোরে। এইজন্যে খোঁজ রাখা ছেড়ে দিয়েছি।'

'না ঠাট্টা নয়। ওকে আমার ভীষণ দরকার।'

'যেখানেই যাক না কেন আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই ঘণ্টা দেড়েক আগেও খুটুর মুটুর আওয়াজ পেয়েছি দেয়ালের ওপাশ থেকে। অপেক্ষা করতে চাইলে আমার সাথে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসতে পারেন। ফ্রী স্টাইল, বাটারফ্লাই, ব্রেস্ট স্ট্রোক আর ব্যাক স্ট্রোকের একদা-চাম্পিয়ানকে দেখতে পাবেন ইন অ্যাকশন। রোজ আধ ঘণ্টা সাঁতার না কাটলে ম্যাজ ম্যাজ করে গা-টা।'

পাইলটের পিছন পিছন পুকুরের দিকে চলল রানা। ছিপছিপে লম্বা সুন্দর ফিগার কামরুজ্জামানের।

'ছুটিতে আছেন না ছাঁটাই হয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জামানকে ছাঁটাই করা চাট্টিখানি কথা নয় স্যার।' হাসল পাইলট। 'একটা জাহাজও ক্র্যাশ ল্যান্ড করাইনি গত তিনটে মাস। খুশি হয়ে কর্তৃপক্ষ ছুটি দিয়েছে

তিন দিনের।'

পুকুর ঘাটে পৌঁছেই দেখতে পেল রানা একটা বেবীট্যাক্সী থেকে নামছে মিসেস জোন্‌স ধীরে সুস্থে সাবধানে। পাইলটকে 'আসছি' বলে এগিয়ে গেল রানা দ্রুত পদে। পিছন থেকে আক্ষেপ করল জামান, 'ইশ্‌-শ্‌…এত কষ্ট করে একজন দর্শক জোগাড় করেছিলাম, নিল কেড়ে।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো কাপড়ে মোড়া মিসেস জোনসের। শোক-পোশাক। চোখ দুটো ভেজা। রানা বলল, 'কেমন আছেন মিসেস জোনস? আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

ভেজা চোখে রানাকে দেখল বুড়ি। 'আমি খুবই দুঃখিত। তুমি যে আসবে বলেছিলে সেকথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছি।'

রানা বোঝাবার চেষ্টা করল যে ওর আসবার কথা ছিল না, কিন্তু নিজের চিন্তায় ডুবে গেছে ততক্ষণে বৃদ্ধা, শুনতে পেল না রানার কথা। 'গোরস্থানে গিয়েছিলাম। রোজই যাই।'

ডক্টর রুহুল আমীনের সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করল রানা। তার প্রতি কি অবিচল স্নেহ ছিল বৃদ্ধার, ভাবতে গিয়ে গুলিয়ে এল মাথাটা। একজন জুয়াড়ী কি এমন ভাবে জয় করতে পারে মানুষের হৃদয়? কথা বলে চলেছে বুড়ি, 'কিন্তু আজকে বড় খারাপ ব্যবহার করল ওরা আমার সাথে। একটা খেলনা পেয়ে গেলাম হঠাৎ কাল রাতে। লুকিয়ে রেখেছিল দুষ্টুটা। কাল রাতে ঘুমোতেই পারিনি একটুও। সকালে ওটা নিয়ে গেলাম। কিন্তু কোন কথা শুনতে চায় না ওরা। বলে যে কবর দেবার আগে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি করে দেব, পেলাম তো কাল রাতে। বুঝতে চায় না।' রেগে গেল বৃদ্ধা। 'তোমার কি মনে হয়?'

বিপদে পড়ল রানা। কোন্ বিষয়ে কি বলছে বুড়ি বুঝতে পারেনি সে। অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। কার কথা বলছেন?'

'টম্‌। তুমি জানো না? পরশুদিন ভোর রাত্রে মারা গেছে টম্‌। আমাদের নারিন্দা সেমিট্রির একপাশে একটা পেট সেমিট্রি আছে। ওখানে ওর জন্য জমি কিনে কবর দিয়েছি। পাকা করার জন্যে টাকা দিয়েছি—কিন্তু আমার অনুরোধ রাখল না ওরা কিছুতেই।' কাঁপা হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে হাড়ের মত দেখতে একটুকরো রবার বের করল বৃদ্ধা। 'এটা নিয়ে অবশ্য ও বেশি খেলত না। অন্যান্য সবগুলো দিয়ে দিয়েছি কফিনের ভিতর। তোমার কি মনে হয়? ওর কি খুব খারাপ লাগবে এটা ছাড়া?'

বুড়ির চিন্তা সূত্রটা পেয়ে গেছে রানা। 'নাহ্‌, মোটেও না। বরং খুব খুশি হবে।'

'কেন?' রানার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর খুঁজছে বৃদ্ধা।

'এটা ওর বেশি প্রিয় খেলনা ছিল না। এটা ও ইচ্ছে করেই লুকিয়ে রেখে গেছে। খুঁজে পেয়ে এটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝেই আপনি ওর কথা ভাববেন, তাতেই ও খুশি হবে বেশি।'

'ঠিক বলেছ।' দরদর করে পানি বেরিয়ে এল বৃদ্ধার চোখ থেকে। 'তুমি ঠিক বলেছ কিন্তু।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। 'এসো, এক কাপ চা খাবে আমার সাথে।' যত্নের সাথে রবারের টুকরোটা ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে এগোল বৃদ্ধা। সেই সাথে বক বক করে চলেছে, 'ডাক্তারের মৃত্যুর পর বড় মনমরা হয়ে গিয়েছিল টম। একরাশ দুঃখ নিয়ে মারা গেছে বেচারা। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় টম স্বর্গে যাবে? কুকুর হলে কি, ওরও তো আত্মা আছে?'

এসব আধ্যাত্মিক প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে রানা বলল, 'ডাক্তার সাহেব প্রত্যেক মঙ্গলবারে আসতেন আপনার কাছে, না এক সপ্তাহ পর পর?'

'প্রত্যেক মঙ্গলবারে।'

একটু থমকে গেল রানা। মাসের প্রথম ও তৃতীয় মঙ্গলবার হলে ওর বড় উপকার হত। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই জিজ্ঞেস করল, 'শেষ কবে এসেছিলেন ডাক্তার সাহেব?'

'কেন, গত মঙ্গলবার!'

রানা বুঝল বয়সের ভারে সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বৃদ্ধা। কারণ গত মঙ্গলবার ভদ্রলোক গোরস্থানে। আসলে এসেছিল তার আগের মঙ্গলবার। অর্থাৎ তিরমিজের সাথে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সম্ভব। মিসেস জোনসের পিছু পিছু ঘরে এসে বসল রানা। সত্যিই। টম নেই বলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ঘরটা। আরও অগোছাল হয়ে গেছে সবকিছু। বিষাদ ছড়িয়ে আছে সারাটা ঘরে।

'আরেকটা প্রশ্ন। তিরমিজ দ্বীপের কথা বলেছিলেন ডাক্তার সাহেব আপনাকে? কখনও আলাপ হয়েছিল?'

'একবার।' কেমন একটু মনমরা হয়ে গেল বৃদ্ধা। 'মঙ্গলবার না এসে বুধবার এল ডাক্তার। আমি বলেছিলাম, কেন শুধু শুধু জংলী লোকগুলোর পিছনে এত সময় নষ্ট করো, এখানে তো তোমার অনেক কিছু করার আছে। কেন জানি রেগে গিয়েছিল, একটু দুর্ব্যবহারই করে ফেলেছিল আমার সাথে। বলেছিল—জংলীদের কাছে আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ওদের জন্যেই এরকম বেগার খাটতে পারছি আপনার পিছনে। অবশ্য পরে লজ্জা পেয়েছিল। আসলে খুবই ভাল মানুষ ছিল তো? আমাকে ভোলাবার জন্যে পরের বার আমার জন্যে একটা সুন্দর গরম শাল এনে দিয়েছিল।'

বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। অন্ধকার হাতড়ে এতদিনে পথ পেয়েছে সে।

'অনেক ধন্যবাদ মিসেস জোন্স। আপনাকে ছোট্ট একটা বাচ্চা কুকুর এনে দিতে পারি। নেবেন?'

'না, না। তা করতে যেয়ো না। তোমরা ছেলেমানুষ, কিছু হারিয়ে গেলে সেটা পূরণ করে নেয়ার বয়স আছে। কিন্তু আমার এই বয়সে স্মৃতিটাই অমূল্য। সবটাই তো ক্ষতির খাতায়, ক্ষতি পূরণের তাড়া নেই।'

বেরিয়ে এল রানা। চমৎকার সহজ সচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ফ্রী স্টাইল সাঁতার কাটছে পাইলট। পা দুটো চলছে দ্রুত প্রপেলারের মত, প্রতি স্ট্রোকে ছয়বার। হাত দুটো দেখে মনে হচ্ছে খুব আয়েস করে, খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে। কিন্তু আসলে অত্যন্ত দ্রুত সাঁতার কাটছে সে। ডান হাতটা ছপাৎ করে পানিতে পড়ছে, সেই সাথে মুখটা ভেসে উঠছে পানির উপর, হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে, আবার চলে যাচ্ছে মুখটা পানির নিচে, ছপাৎ করে আলস্য ভরে পানিতে পড়ছে বাম হাত। গতি বোঝার উপায় নেই সাঁতার সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে।

ঘাটে এসে থামল পাইলট। কুলি করল বার তিনেক, ডুব দিল একটা, তারপর উঠে এল।

'কিছু বলবেন মনে হচ্ছে? আপনাকে দেখে উঠে এলাম; নইলে আরও বার দশেক এপার ওপার করতাম।' তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছে নিয়ে সেটাকে আলোয়ানের মত গায়ে জড়াল। 'মিসেস জোন্স কি রাজী হয়েছে বিয়ে করতে?'

মৃদু হাসল রানা। 'আপনি সেদিন বলেছিলেন সাহায্য করতে পারলে সুখী হবেন। হঠাৎ আপনার সাহায্য দরকার হয়ে পড়েছে। করবেন?'

'মুখে বলা আর কাজে করা এক নয়। তাছাড়া কথা রাখা আমার স্বভাবে নেই। তবু শুনি, কি সাহায্য?'

'আমি আসলে জানতে চাই পুলিস দেখে ভয় পেয়ে দৌড় দিল কেন ডক্টর রুহুল আমীন। আমার স্থির বিশ্বাস, তিরমিজ দ্বীপ আর মিসেস জোনসের সাথে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক আছে। এদিকে চেষ্টা করে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। এবার তিরমিজ দ্বীপে যেতে চাই আমি। কালকেই। আগামীকাল ডাক্তারের ওই দ্বীপে যাওয়ার তারিখ।'

'খুব ভাল। পারলে যুবতী দেখে একটা জংলী মেয়ে নিয়ে আসবেন আমার জন্যে।'

'আমি প্লেন চার্টার করব। তিনদিনের ছুটি আছে বলছেন। আপনাকে ড্রাইভার হিসেবে পেতে পারি?'

'কত দিবেন হুজুর?' তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে কানের পানি বের করছে জামান।

'আপনাকে পয়সা দিতে পারব না। প্লেন ভাড়া করতেই আমার সব টাকা খরচ হয়ে যাবে। সেদিন দুঃখ করছিলেন, জমজমাট চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটার সময় অন দ্য স্পট থাকার সুযোগ হয় না আপনার জীবনে—এবার সে সুযোগ হতে পারে।'

'বাহ্, চমৎকার অফার তো।'

'তার মানে রাজী?'

'উঁহুঁ। তার মানে ভেবে দেখব।'

■. হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল মতলব আলী। 'এই যে, সাহেব!' রানাকে বলছে। 'আবার এখানে কি চান আপনি? মহা জ্বালার মধ্যে ফেললেন দেখছি। আপনাকে এই বাউন্ডারির মধ্যে ঢুকতে কে বলেছে? সেদিন না বলে দিয়েছি আর আসবেন না এখানে? তিন-তিনজন ভাড়াটে নোটিশ দিয়েছে আমাকে···যথেষ্ট হয়েছে। এবার দয়া করে···'

'যাচ্ছি আমি।' পাইলটের দিকে চাইল রানা। 'ভেবে বের করতে পারলেন কিছু?'

'কই সাহেব, গেলেন না? ভাড়াটেদের পিছনে এরকম জোঁকের মত লেগে থাকলে···'

'শাট্ আপ।' ধমক দিল পাইলট। ইনি আমার গেস্ট। আমার গেস্টকে তুমি এই ধরনের কথা বলতে পারো না বদ্-মতলব আলী। আমরা তিরমিজ দ্বীপে বেড়াতে যাব ভাবছি, আর তুমি সব ভণ্ডুল করে দিতে চাও? তোমার বদ্-মতলব নিয়ে অন্যখানে অন্যকিছুর চেষ্টা করোগে যাও।'

'ও।' চুপসে গেল যেন মতলব আলী। 'আপনার অতিথি হলে অবশ্য আমার বলার কিছুই নেই। পিছন ফিরল সে। কিন্তু যাওয়ার আগে শুনিয়ে দিল, কিন্তু বড় উদ্ভট সব অতিথি আসে আপনার কাছে জামান সাহেব।'

'হ্যাঁ। উদ্ভট লোক পছন্দ করি আমি। তোমারও আমন্ত্রণ রইল।' বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জামান অপসৃয়মান মতলব আলীর পিঠের দিকে। নিচু গলায় বলল, 'তোমার কি রে বাপু? তোর এত চিড়বিড়ানি কেন? তুই তো হুকুমের চাকর। ভাবটা যেন সে জেড্ এ্যান্ড জেডের ডাইরেক্টার! নাও চল, পেগ তিনেক হুইস্কি না খেলে কিছু ভাবতে পারব না আর। চলো, ঘরে গিয়ে আলাপ করা যাবে।'

জামানের আন্তরিকতা সহজভাবে গ্রহণ করল রানা। 'চলো। কিন্তু সাহায্য আমাকে করতেই হবে তোমার।'

# নয়

নতুন তথ্য পাওয়া গেল।

বারো, তেরো, চোদ্দ—এই তিনটি ফ্ল্যাট বাড়ির ম্যানেজমেন্টের ভার জেড্ এ্যান্ড জেডের সুযোগ্য হাতে ন্যস্ত করে মালিক বিলেত বাস করেন। কয়েক জায়গায় টেলিফোন করেই জানা গেল খবরটা। আরেকটা খবর, আহমেদ আলী ইনস্টিটিউটের ম্যানেজমেন্টের ভারও ওই একই কোম্পানীর উপর ন্যস্ত আছে। বেশ ঘনিয়ে উঠছে ব্যাপারটা। জটিলতর হচ্ছে।

অলোকাকে ফোন করল রানা। 'আপনার ওখানে আসতে চাই একটু।'

'কেন?'

'আমি কাল সকালে তিরমিজ দ্বীপে যাচ্ছি। যে কাপড়ের পোঁটলাটার কথা বলছিলেন কাল, ওটা আমাকে দিলে আমি পৌঁছে দিতে পারি যথাস্থানে।'

'ঠিক আছে'। ছ'টার দিকে আসুন। এক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছি আমি একটা ইন্টারভিউ দিতে ছ'টার সময় অফিসে আসব একবার। আজকেই চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় হয়ে যাচ্ছি আমি এখান থেকে।'

সোহানার বাসায় গেল রানা।

রানার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে চমকে গেল সোহানা। সব শুনে বলল, 'কাপড়গুলো সাথে নিয়ে যাওয়ার কি উদ্দেশ্য?'

'প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য আর একবার অলোকার সাথে কথা বলে এবং ওকে দেখে শ্রবণ ও নয়নেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি। অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে ড. রুহুল আমীনের তরফ থেকে যাচ্ছি আমি, জংলীদের মনে এরকম একটা ভাব সৃষ্টি করা। একই দিনে প্লেনে করে ওদের জন্যে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'তোমার ধারণা সব রহস্যের মূল ওখানেই?'

'মূলটা ঠিক কোথায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা করতে পারিনি এখনও। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, কিছু একটা ব্যাপার আছে তিরমিজে। এমন কিছু আছে, যেটা আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে ডাক্তারের জীবন। ওর মৃত্যুর জন্যেও হয়তো জংলীরাই দায়ী।'

'বুঝলাম। কাল ওই দ্বীপে যাচ্ছ তাহলে। ইতিমধ্যে আমার কি কাজ?'

'তোমার কাজ হচ্ছে এই মুহূর্ত থেকে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা সদা সতর্ক এবং প্রস্তুত থাকা। হালকাভাবে নিয়ো না কথাটাকে। কেবল সতর্ক থাকলে চলবে না, সশস্ত্রও থাকতে হবে। আমরা একটা বিরাট দুর্ধর্ষ দলের বিরুদ্ধে কাজ করছি। যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ আসতে পারে যে কোন দিক থেকে।'

'কেবল সতর্ক থেকে প্রাণ বাঁচাতে হবে, নাকি কিছু কাজও আছে?'

'কাজ আছে। উপযুক্ত সময়ে কাজের ভার দেব। এখন শুধু সতর্ক থাকবে।'

ঠিক ছয়টা পাঁচে পৌঁছল রানা। দরজা বন্ধ। পিতলের নব ঘুরাবার চেষ্টা করল রানা। তালা দেয়া। টোকা দিয়ে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না কোন। দাঁড়িয়ে রইল রানা খানিকক্ষণ, তারপর পায়চারি শুরু করল। আধ ঘণ্টা পর সন্দেহ এল মনে, ভুলে যায়নি তো? আরও পনেরো মিনিট কাটল। রানা বুঝতে পারল, এত দেরি হবার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না, হয় ভুলে গেছে, নয়তো মত পরিবর্তন করেছে।

আরও পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করল রানা। শেষ বারের মত দরজার নবটা নাড়া দিল সে, টোকা দিল কয়েকবার। কোন সাড়াশব্দ নেই।

■. অনেকক্ষণ ধরেই দূর থেকে লক্ষ করছিল রানাকে আরেকজন ডাক্তারের চেম্বার-অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রতি বিশ মিনিট অন্তর বেরিয়ে আসছে লোকটা করিডরে বিড়ি ফোঁকার জন্যে। চতুর্থবার বেরিয়েও যখন দেখল দরজায় টোকা দিচ্ছে রানা তখন এগিয়ে এল কাছে।

'কাকে খুঁজছেন? চেম্বার তো বন্ধ। ডাক্তার সাহেব মারা গেছেন কয়েকদিন আগে।'

'আমি তাঁর নার্সকে খুঁজছি। দেখা করার কথা ছিল আজকে। দেখেছেন ওকে?'

'আপনি কি পেশেন্ট?'

'না, ইমপেশেন্ট। সেই ছ'টা থেকে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমাদের চেম্বারে বসতে পারেন।'

'অনেক ধন্যবাদ।' লোকটির সৌজন্যে একটু লজ্জিত হলো রানা। একটু আগেই তির্যক একটা ভঙ্গি নিয়েছিল সে। 'আমি বরং বাড়ি চলে যাই।' পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে দিল ওর হাতে। 'যদি দেখা পান ওর, দয়া করে বলবেন যেন ফোন করে।'

চিন্তিত মুখে বাসার দিকে রওনা হলো রানা। দুপুর বেলা গরম পানিতে গোসল করে এবং আরও দুটো ডিসপ্রিন খেয়ে শরীরের ব্যথাটা দাবিয়ে রেখেছিল সে এতক্ষণ, আবার চেগিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। কেমন যেন ফাঁকা লাগছে সবকিছু। কাল সকালের আগে কাজ নেই তেমন কিছু। রাত্রিটা পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে পারলে কাল অনেকটা সুস্থ বোধ করবে সে বুঝতে পারছে। আগামী পরশু মাহবুবকে হাজির করা হবে কোর্টে। কতদূর এগোতে পারল রানা এই কদিনে? এদিকে খবরের কাগজগুলো প্রায় দেবতা করে তুলেছে ডক্টর রুহুল আমীনকে। রীতিমত ক্যাম্পেইন চালিয়ে লাখ টাকার ওপর ফান্ড তোলা হয়েছে ডাক্তারের অর্ধসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শুধু তিরমিজেই নয়, বাংলাদেশের দুইশো দুর্গম জনবসতির একটা লিস্ট তৈরি করা হয়েছে ডক্টর রুহুল আমীন মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে—কয়েকজন ডাক্তার প্রতিমাসে অন্তত একবার করে চিকিৎসা করতে যাবে এইসব জায়গায়। প্রচার একেই বলে। প্রতিদিন দশ ডিগ্রি করে বেড়ে যাচ্ছে ডাক্তারের সুনাম, প্রতিদিন দুরূহতর হয়ে যাচ্ছে দেবতাটিকে ধূলির ধরাতলে নামিয়ে আনা।

বাসায় পৌঁছে মনটা খুশি হয়ে উঠল রানার। জামান এসেছিল, একটা সুপার গুজ সীপ্লেন চার্টার করেছে সে, কাগজ পত্র পৌঁছে দিয়ে গেছে বাসায়। কাজের লোক। অবশ্য নিজে পাইলট বলে ওর পক্ষে এসব কাজ সহজ চেনা জানা আছে সবার সাথেই। জামান ছাড়াও একজন মহিলা নাকি এসেছিল, চেনে না তাকে রাঙার মা। শ্যামলা রঙ, নীল ছাপা শাড়ি—এর বেশি জানা গেল না।

খেয়ে নিল রানা ন'টার দিকে। লম্বা একটা ঘুম না দিলে পেশীগুলোকে আয়ত্তে

আনা যাচ্ছে না।

শোবার ঘরে ঢুকেই কেন যেন সজাগ হয়ে উঠল রানার চোখ দুটো। খাটের তলা এবং ঘরের চারপাশে দেখে নিয়ে বাথরুমটা পরীক্ষা করল সে। দরজাগুলো দেখা দরকার। বাথরুমে দুটো দরজা—একটা ভিতর দিকে অপরটা সুইপারের জন্যে, বাইরের দিকে। তোয়ালেটা এমন ভাবে ঝোলানো যে বাইরের দরজার বল্টু দেখা যায় না। তোয়ালে সরিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রানা বল্টুটা।

ঘরে এসে খাটের কিনারে বসল সে। দুটো ডিসপ্রিন হাতে নিল খোসা ছাড়িয়ে। ব্র্যান্ডির বোতলটা হাতে তুলেই আবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ওর চোখ। ভুরু জোড়া কুঁচকে গেছে। ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল সেটা সাইড টেবিলে। উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি নিয়ে উদরস্থ করল সে ডিসপ্রিন দুটো।

ড্রয়ার টান দিয়ে ল্যুগারটা বের করল রানা। রিলিজ বাটন টিপে ম্যাগাজিন বের করে নিল। স্লাইড টেনে চেম্বারের গুলিটা বের করে নিয়ে পরীক্ষা করল পিস্তলটা। হ্যামার, ইজেক্টার স্প্রিং, ট্রিগার অ্যাকশন ঠিকই আছে। আবার লোড করল সে পিস্তলটা, তারপর সাইলেন্সার পাইপ লাগাল ওটার মুখে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। উজ্জ্বল বাতিটা নিভিয়ে পাঁচ ওয়াটের নীল বাতি জ্বেলে দিয়ে বিছানায় এসে বসল সে আবার।

বালিশে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। গোটা তিনেক সিগারেট ধ্বংস হলো কেবল। সমাধান পাওয়া গেল না সমস্যার। কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না এক তথ্যের সাথে আরেকটাকে।

চমকে উঠল রানা হঠাৎ কানের পাশে টেলিফোনটা বেজে উঠতেই। বোধহয় অলোকা ফোন করেছে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে কেন কথা রাখতে পারেনি। আমার না, ভী···ষ···ণ···

না। ফোন করেছে জামান।

'কি করছ গোয়েন্দা সাহেব?'

'বিছানায়।'

'কাগজপত্র পেয়েছ সব? উহ্, ঝামেলা পোহাতে হয়েছে অনেক। আমিও ঘুমিয়ে পড়ব ভাবছি, কিন্তু হয়ে উঠছে না। বোতলটায় আর মাত্র পেগ তিনেক আছে। আর একটা, আর একটা, করতে করতে ছয় পেগ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এবার বাকিটুকু ঢুক করে মেরে দিয়ে শুয়ে পড়ব।'

লোলুপ দৃষ্টিতে ব্র্যান্ডির বোতলটার দিকে চাইল রানা একবার। খুব মৌজে আছে ব্যাটা।

'আমিও ভাবছি আউন্স তিনেক খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। কিন্তু তুমি এত খাচ্ছ কেন, কাল আটটায় উঠতে পারবে তো!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আটটায় এয়ারপোর্টে পাবে আমাকে। এক-আধ ঘণ্টা দেরি হলে তুমি উঠে পোড়ো আকাশে, আমি দৌড়ে ধরে নেব। বাই বাই।'

বেড-সুইচ টিপে দিতেই নিভে গেল নীল বাতিটা। রানার ঘরটা অন্ধকার এখন।

রাত সাড়ে এগারোটা।

সাদা একটা ফোক্সওয়াগেন ছুটে আসছে ষাট মাইল বেগে। আরোহী চারজন। রানার বাসা থেকে দেড়শো দুশো গজ দূরে থাকতেই গিয়ার নিউট্রাল করে হেড-লাইট আর ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল ড্রাইভার। বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। মসৃণ রাস্তার সাথে চলন্ত চাকার ঘর্ষণের ফলে মৃদু একটা চড় চড় শব্দ আসছে কেবল। বেশ কিছুদূর সমান গতিতে গিয়ে ধীরে ধীরে গতিবেগ কমে এল গাড়িটার। রানার বাসার সামনে এসে থেমে দাঁড়াল একটা কামিনী ঝোপের আড়ালে। নিঃশব্দে।

নিঃশব্দে নামল চারজন। দু'জনের হাতে পিস্তল, দু'জনের হাতে ছুরি। রানার শোবার ঘরের খাটের কাছে দুই জানালায় দাঁড়াল দু'জন পিস্তলধারী। খাটের উপর আবছা দেখা যাচ্ছে শুয়ে আছে একজন, গায়ে চাদর ঢাকা। ছুরি হাতে বাকি দু'জন পিছন দিকে চলে এল। বাথরুমের বাইরের দিকের দরজার কাছে। সিঁড়ি দিয়ে তিন ধাপ উঠে আস্তে সাবধানে ঠেলা দিল একজন দরজায়। খুলে গেল একপাট দরজা। এবার অপর পাটটা খুলে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল ওরা বেডরুমের দিকে।

একজন হৃৎপিণ্ড আর একজন পেট সই করে ছুরি চালাল এক সাথে। ছুরি মেরেই হতভম্ব হয়ে গেল দু'জনই। কিন্তু সামলে ওঠার আগেই প্রচণ্ড বেগে কি যেন এসে লাগল ঘাড়ের পিছনে। ঘুপ্ ঘাপ্ করে দুটো আওয়াজ। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মেরেছে কেউ। মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল দু'জন মেঝের উপর।

'কিরে, কি হলো?' ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল খাটের মাথার কাছে জানালায় দাঁড়ানো লোকটা। 'ইদ্রিস! কি হলো?'

কোন জবাব নেই। বিচলিত হয়ে উঠল বাইরের দু'জন।

'কি হলো, ইদ্রিস?'

'চুপ।' চাপা কণ্ঠ শোনা গেল।

আশ্বস্ত হলো পিস্তলধারী। আধ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অস্থির হয়ে উঠল সে আবার। 'ইদ্রিস!'

ঠিক এমনি সময় পিছন থেকে একটা জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। রানার কণ্ঠস্বর।

'হ্যাণ্ডস্ আপ।'

টাশশ্! ঘুরেই গুলি করল লোকটা! খান খান হয়ে গেল রাত্রির নিস্তব্ধতা। দূরের একটা বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল গুলির প্রতিধ্বনি। টাশ্শ্! আবার গুলি। দৌড় দিল দু'জন দু'দিকে।

ঘাসের উপর শুয়ে ছিল রানা। তড়াক করে উঠে হাঁটু গেড়ে বসে গুলি ছুঁড়ল।

ছোট্ট একটা কাশির আওয়াজ তুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল পিস্তলের মুখ থেকে একটা নাইন এম. এম. বুলেট। মাথার উপর হাত ছুঁড়ে হুড়মুড় করে পড়ল একজন লনের উপর। অপরজন ততক্ষণে গেটের কাছে। আবার গুলি করল রানা। ঠন্ করে ঢুকল গুলি ফোক্সওয়াগেনের বনেটে। টাশ্‌শ্! রানার হাতখানেক তফাতে মাটিতে লাগল গুলি। ছিটে এসে মাটির কণা লাগল নাকে মুখে। আবার গুলি করল রানা। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িতে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে লোকটা। হুশ করে চলে গেল ফোক্সওয়াগেন নাগালের বাইরে।

লনের উপর পড়ে থাকা লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বাম দিকের শোল্ডার ব্লেড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। জ্ঞান হারিয়েছে সাথে সাথেই। কিন্তু বাঁচবে।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েই হোঁচট খেল রানা। হোঁচট খেয়েই টের পেল ওটা একটা জ্ঞানহীন দেহ। মুহূর্তে এক লাফে সরে গেল সে। কারণ নিমেষে বুঝে নিয়েছে সে যে ঘরের ভিতরের যে কোন একজন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে কিছুক্ষণ আগেই, টেনে নিয়ে এসেছে সঙ্গীকে দরজা পর্যন্ত, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না রানা ওকে, কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে রানার ছায়াটা পিছনে আকাশ থাকায়। এখুনি ছুরি চালাবে ও।

লাফ দিয়েই পা বেধে গেল রানার বাথটাবের কিনারে। পড়ে গেল সে। মাথাটা ঠুকে গেল মোজাইক করা দেয়ালে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর লোকটা। অন্ধের মত ঘুষি চালাল রানা। অনুভব করল খচ্ খচ্ করে বাম বাহুতে ঢুকল ছোরাটা দু'বার। অন্ধকারে টের পাচ্ছে না লোকটা কোথায় মারছে।

ঠিক এমনি সময়ে হুইস্‌ল্ শোনা গেল বাইরে। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটা। সাথে সাথেই লাথি চালাল রানা। তলপেটে লাথি খেয়ে ছিটকে চলে গেল লোকটা দরজার কাছে, সঙ্গীর গায়ে পা বেধে ডিগবাজি খেয়ে চলে গেল বাইরে। পিস্তলটা বের করে হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়েই দেখতে পেল রানা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে লোকটা বাড়ির পিছনের বাউন্ডারির দিকে।

জ্বলে উঠল একটা টর্চ। চোখ ধাঁধানো আলো পড়ল রানার মুখে। একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল টর্চের পিছনের অন্ধকার থেকে।

'পিস্তল ফেলে দিন মিস্টার মাসুদ রানা। নইলে গুলি করব। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।'

# দশ

একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ রানা, ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে।

নইলে এরকম বেপরোয়া আক্রমণ আসত না। কারও পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে সে। কোন একটা স্পর্শকাতর নার্ভ সেন্টারে হাত দিয়ে ফেলেছে ও। এখনও মুখটা চেনা যাচ্ছে না শত্রুর, কিন্তু কাছে পিঠের পরিচিত কেউ হবে। মোটামুটি আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। লোকটা এমন কেউ, যার সাথে ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; এমন কেউ, যার সাথে আলাপ হয়েছে রানার; এমন কেউ, যে রানার বাসায় এসেছিল; এমন কেউ, যে রানার গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল; এমন কেউ, যে জানত রানা কখন বাসায় নেই। বৃত্তটা ছোট হয়ে আসছে। একটা বিন্দুতে এনে দাঁড় করাতে হবে। দরজার বল্টুটা খুলে রেখে গিয়েছে। ব্যান্ডির বোতলে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে গেছে। কে হতে পারে? খুব সহজে ঘুমের ওষুধ সংগ্রহের সুবিধা কার আছে?

অলোকা?

'এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব। তারপর পায়ে গুলি করব। পিস্তল ফেলে দিন মিস্টার মাসুদ রানা। এক...'

সংবিৎ ফিরে পেল রানা। পুলিসের সাড়া পেয়ে আশ্বস্ত বোধ করছিল সে, কিন্তু এ কী বিপদ। চট্ করে ছেড়ে দিল পিস্তলটা হাত থেকে। খটাং করে মেঝেতে আওয়াজ হলো। হ্যাঁ, কি যেন বলেছিল টর্চধারী? ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। কেন! সজাগ হয়ে উঠল রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। বিপদ!

'এবার মাথার উপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়ান। ধীরে ধীরে এগোন ওই ঘরের দিকে।'

আদেশ পালন করল রানা। টর্চ হাতে পিছু পিছু এল লোকটা। একজনকে অর্ডার দিল, 'এই বডিটা দেখো মারা গেছে কিনা। এটাকেও জীপের পিছনে তুলে তোমরা তিনজন পাহারায় থাকো। আমি আসছি। আর সিদ্দিক দৌড়েছে আরেকজনের পিছু পিছু। ফিরে এলে এখানে পাঠিয়ে দেবে।'

'ইয়েস স্যার।'

টর্চের আলোয় ঘরের সুইচ খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বেলে দিল লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, অল্প বয়সী সাব-ইন্সপেক্টর একজন। কাছে এসে পিছন থেকে দক্ষ হাতে সার্চ করল রানাকে, কিছু না পেয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। 'এবার ঘুরে দাঁড়াতে পারেন আপনি। হাতের কাটা জায়গায় রুমাল চাপা দিতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'কি ব্যাপার মিস্টার রুস্তম আলী?' বাম হাতের ক্ষত দুটোর দিকে একবার চেয়ে প্রশ্ন করল রানা। রক্ত ঝরছে টপ টপ।

'আপনি আমাকে চেনেন?' অবাক হলো সাব ইন্সপেক্টর।

'নাম শুনেছি। আপনি মাহবুবের বন্ধু।'

'হ্যাঁ। অকৃত্রিম বন্ধু বলতে পারেন। আমি জানি, আপনি মাহবুবের হয়ে কাজ করছিলেন। ও. সি. সাহেবের বোকামিতে দুর্নামও সহ্য করেছেন মুখ বুজে।

আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আমি অর্ডার পালন করছি মাত্র। কিন্তু এখানে এসে দেখছি কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে। ব্যাপারটা কি?'

'আমাকে খুন করতে এসেছিল চারজন।'

'কেন?'

'সেটা আমারও প্রশ্ন।'

'এমনি হঠাৎ এসে হাজির হলো ওরা?'

'না। রীতিমত প্ল্যান করে এসেছে। আমি পৌনে ছ'টায় বেরিয়ে যাই বাসা থেকে। সেই ফাঁকে ওদের লোক এসেছিল আমার বাসায়। ওই বাথরুমের দরজার বল্টুটা খুলে রেখেছিল, ব্র্যান্ডির বোতলে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। টের পেয়ে ওদের ফাঁদে পা না দিয়ে ঘর অন্ধকার করে অপেক্ষা করছিলাম আমি। ওই দেখুন আমাকে মনে করে বালিশ দুটোকে কি ভাবে স্ট্যাব করা হয়েছে।'

পরীক্ষা করল রুস্তম আলী বালিশগুলো। ব্র্যান্ডির বোতলটা তুলে বোতলের গায়ে সামান্য লেগে থাকা বারবিচুরেটের গুঁড়ো পরীক্ষা করল, চেটে দেখল তেতো কিনা। তারপর বলল, 'বসুন মিস্টার মাসুদ রানা। একটু ভাবতে হবে আমাকে। আমার প্রতি জালাল শিকদার সাহেবের ব্যক্তিগত অনুরোধ—মাসুদ রানাকে সব রকম সাহায্য করবে; আর অফিশিয়াল অর্ডার—মাসুদ রানাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবে। কি করব বুঝতে পারছি না। গুলিয়ে আসছে মাথাটা। এদিকে নিজ চোখে স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে খুন করতে চাইছে একদল লোক; আবার ওদিকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ...'

'কি অভিযোগ?'

'কড়া অভিযোগ। বলপূর্বক অনুপ্রবেশ, চুরি, ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত, এবং সম্ভাব্য খুন। আচ্ছা...পৌনে ছয়টায় বাসা থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? আপনি?'

'ডক্টর রুহুল আমীনের চেম্বারে। বায়তুল মোকাররম। ওঁর নার্স অলোকা সেনের সাথে দেখা করতে। কেন?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সাব-ইন্সপেক্টর রুস্তম আলী রানার মুখের দিকে। দশ সেকেন্ড পর মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্। আপনি নিশ্চয়ই নন। মানুষ এতটা ভাল অভিনয় করতে পারে না।'

'কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না। অলোকার কিছু হয়নি তো! একটু বুঝিয়ে বলুন, এবং তাড়াতাড়ি।'

'হয়েছে। সাড়ে সাতটার সময় চেম্বারের পজেশন অপর একজন ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিতে লোক গিয়েছিল জেড এ্যান্ড জেড কোম্পানী থেকে। ঘরের সমস্ত জিনিস পাওয়া গেছে ভাঙাচোরা অবস্থায়, ওয়াশ-বেসিনের পাশে পাওয়া গেছে অলোকা সেনের জ্ঞানহীন দেহ, ছুরি দিয়ে কাচা হয়েছে ওকে মোরব্বার মত।'

'মারা গেছে?'

'এখনও যায়নি, কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ, যেকোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। একজন কেমিস্ট পৌনে ছ'টায় দেখেছে অলোকাকে চেম্বারে ঢুকতে, আরেকজন পৌনে সাতটায় আপনাকে ওখান থেকে চলে যেতে দেখেছে। দরজার নবের উপরে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। ডক্টর আনিসের চেম্বার-অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনাকে নবে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে। থানা যদি নন্-কোঅপারেশন করে সেই ভয়ে সমস্ত পত্রিকা অফিসে খবর দিয়ে দিয়েছে কেউ। সারাটা থানা এখন কিলবিল করছে রিপোর্টারে।'

'তারা এখান পর্যন্ত এল না কেন?'

'কেউ ভাবতেই পারেনি যে আপনাকে বাসায় পাওয়া যাবে।'

'যাক, একটাই মাত্র সুখবর আছে আমার জন্যে।' বলল রানা। 'মেয়েটা মারা যায়নি। ওই মেয়েই বলবে যে আমি করিনি কাজটা।'

'যদি বাঁচে তাহলে তো!'

'আশ্চর্য! আমার সাথে দেখা করার কথা ছিল ঠিক ছ'টায়। পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছিলাম। চল্লিশটা মিনিট আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, করিডরে পায়চারি করলাম, অথচ টেরই পেলাম না কিছু। হয়তো তখন মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছে অলোকা ঘরের ভিতর। মেয়েটা আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর বোন।...আচ্ছা, আপনি নিজে দেখেছেন? চেম্বারের অবস্থাটা কি রকম? কি মনে হয়? মারামারি হয়েছিল ওখানে?'

'না। মারামারির মত নয়। মনে হয় কেউ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কিছু সারাটা ঘরে। ড্রয়ারগুলো টেনে সমস্ত জিনিস ফেলা হয়েছে মেঝেতে। যা হাতের সামনে পেয়েছে তাই চুরমার করেছে লোকটা। কিছুই আস্ত রাখেনি। ডক্টর আমীনের ব্যাগটা ফালি ফালি করে কেটেছে ছুরি দিয়ে। এমন কি পুতুলগুলো পর্যন্ত ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে। মনে হয় উন্মাদের কাজ।'

'আপনার কি ধারণা কাজটা আমার হতে পারে?'

'না। সেইজন্যেই দ্বিধায় পড়েছি। একটা ব্যাপার ভাবছি—আমি শুনেছি মাহবুব আর জালাল সাহেবের মত আপনিও বিশ্বাস করেন যে ডাক্তারের কাছে পিস্তল ছিল। আমি অবশ্য একথা বিশ্বাস করি না, কারণ, থাকলে ওটা পাওয়া যেতই। ভাবছি—সেই পিস্তলটা খুঁজে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা করতে গিয়ে আপনার পক্ষে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে...'

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রানা। এক পা পিছিয়ে গেল রুস্তম আলী।

'ঠিক্ বলেছেন! আসলে পিস্তলটাই খোঁজা হয়েছিল ওখানে!' উত্তেজিত ভাবে বলল রানা।

'এটা স্বীকার করলে কিন্তু বিপদে পড়ছেন আপনি।' সাবধানে বলল রুস্তম আলী।

'কাজটা আমি করিনি।' মাথা চুলকাল রানা। 'আমারই মত হন্যে হয়ে পিস্তলটা খুঁজছে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ। কাজটা তাদের। বুল্‌স্ আই হিট করেছেন

আপনি মিস্টার রুস্তম আলী। ইউ আর রাইট! পিস্তল খুঁজছিল।'

'বুঝলাম না।'

'বুঝতে হবে না। একঘন্টা সময় পেলেই মাহবুবের সপক্ষে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলব আমি।'

'সময় পাচ্ছেন কি করে? আপনি নিজেই তো অ্যারেস্টেড। ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার চার্জের বেইল হয় না।'

'কেউ জানে না যে আপনি আমাকে বাসায় পেয়েছেন। একটা ঘন্টা সময় পেলে আমার বা মাহবুবের বিরুদ্ধে সমস্ত চার্জ খণ্ডন করে দিতে পারব। শুধু একটা ঘন্টা সময় দিন।'

'অফিশিয়াল ও আন-অফিশিয়াল অর্ডারের কোন্‌টা পালন করব বুঝতে পারছি না।'

'জালাল সাহেব ঠিক কি অর্ডার দিয়েছেন আপনাকে?'

'উনি বলেছেন, উনি বিশ্বাস করেন না যে ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে আপনি ওই কাজ করতে পারেন। নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতে চাইছে। উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে আপনি পুলিসের হাত থেকে ছুটে বেরোতে বেরোতে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবে সে। ওদিকে আপনাকে গ্রেফতার করার আদেশ না দিয়ে ওঁর উপায় নেই। আমাকে বলেছেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে।'

'অবস্থা কি বুঝলেন?'

'বুঝলাম দারোগা সাহেবের কথাই ঠিক। দ্বিমুখী আক্রমণ চালিয়েছে আপনার উপর কোন অজ্ঞাত শত্রুপক্ষ। আপনাকে খুন করে ফেলতে পারলে সব ঝামেলা শেষ হয়ে যায়, সেজন্যেই খুনের চেষ্টা। কিন্তু যদি কোনভাবে এদের হাত থেকে বেঁচে যান তাহলে পুলিস যেন আপনাকে জেলে পুরে আপনার সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করে দেয়, সে ব্যবস্থাও করে রেখেছে। কিন্তু পুলিস সেটা করবে না।' ছুঁড়ে দিল রানার পিস্তলটা রুস্তম আলী। খপ্‌ করে ধরে ফেলল সেটা রানা শূন্যে। নিজের রিভলভারটাও বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'বেকায়দায় পেয়ে হঠাৎ ছিনিয়ে নিয়েছেন আপনি আমার পিস্তল। বেঁধে ফেলেছেন আমাকে খাটের সাথে। তারপর জীপে বসা সেপাইগুলোর চোখে ধুলো দিয়ে উধাও হয়ে গেছেন।'

'বুঝলাম। অনেক ধন্যবাদ। এক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসব আমি। অবশ্য যদি বেঁচে থাকি।' হাসল রানা।

'দয়া করে প্রমাণ সংগ্রহ করে আনবেন। নইলে আমি আর ও.সি. সাহেব দু'জনেই বিপদে পড়ব। চাকরি যাবে নির্ঘাত।'

'আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করব। নাটকটার শেষ দৃশ্যে চলে এসেছি আমরা। যবনিকার বেশি দেরি নেই। আসুন বেঁধে ফেলি আপনাকে।'

হঠাৎ তৃতীয় একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল! 'আমাকেও বাঁধবেন নাকি সাহেব?'

চমকে চাইল ওরা দু'জন। দরজার দুই চৌকাঠে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ও.সি. জালাল শিকদার। মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। 'ওদের বসিয়ে রেখে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম। রুস্তমের বিবেক-বুদ্ধির ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তবু ভাবলাম, ছেলে মানুষ, যদি ভুল করে ধরে নিয়ে যায় আপনাকে! নাহ্, ছেলেটার মাথায় বুদ্ধি আছে।' গোঁফে তা দিল দারোগা।

কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রুস্তম আলী। রানা হাসল। 'সেক্ষেত্রে বাঁধাবাঁধির কোন প্রয়োজনই নেই। আমি এক্ষুণি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। আপনার সাহায্য আমার দরকার।'

'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি। একবার তো আপনাকে বেইজ্জতির মধ্যে ফেলে ভণ্ডুল করে দিয়েছি সব কুমকুম হকের সাথে ডাক্তারকে জড়াতে গিয়ে। আমার সাহায্য নিলে আবার গোলমাল না হয়ে যায়?'

'না। এবার আর গোলমাল হবে না। আপনারা একটু বসুন, আমি গোটা দুই টেলিফোন সেরে নিই।'

সোহানাকে ফোন করল রানা। জেগেই ছিল সে। কথাবার্তা শেষ করে ডায়াল করল জামানের নাম্বারে। বার দশেক রিং হবার পর ঘুম জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'রং নাম্বার ভাই। ডায়ালের উপর চোখ রেখে ঠাণ্ডা মাথায় আবার রিং করো বাবা।'

'জামান, আমি মাসুদ রানা।'

'জ্বালাতন! তোমার কি ইন্‌সোমনিয়া আছে? নাকি মাথা খারাপ? সকাল আটটা বাজতে এখন তো অনেক দেরি!' বিস্মিত কণ্ঠস্বর পাইলটের।

'চাঞ্চল্যকর ঘটনার জন্যে আক্ষেপ করছিলে সেদিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটতে চলেছে একটা ঘটনা। ইচ্ছে করলে আসতে পারো।'

'ইচ্ছে নেই। না ঘুমোতে পারলে কাল উঠতেই পারব না সকাল সকাল।'

'ওঠার দরকার হবে না। তিরমিজ দ্বীপে যাচ্ছি না আর। যেটা খুঁজছিলাম এতদিন হন্যে হয়ে, সেটা এই ঢাকাতেই আছে। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি সেই প্রমাণ উদ্ধার করতে। আসছ তুমি?'

'কোন ইন্টারেস্টিং ঘটনা না ঘটলে কিন্তু তোমার মাথাটা ফাটিয়ে ঘটনা তৈরি করব আমি বলে দিচ্ছি। তখন আমার দোষ দিতে পারবে না। এত রাতে ঘুম থেকে তুলে…'

'প্রমিজ। ঘটনা ঘটবে। একটা কবর খুঁড়ব আমরা দু'জন।'

# এগারো

রাত পৌনে একটা।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে শহরের বুকে। সারাদিনের প্রচণ্ড উত্তাপ উড়িয়ে নিয়ে গেছে এই হাওয়া। গভীর ঘুমে মগ্ন সারা শহর শীতল প্রশান্তির নরম স্পর্শ পেয়ে। রাস্তায় লোক নেই। আকাশে ছিটে ফোঁটা হালকা মেঘ ভেসে চলেছে উত্তর পশ্চিমে। কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদ উঠেছে পুবের আকাশে।

নিউ সার্কুলার রোডের একটি মোড়ে থামল একখানা পুলিস-জীপ। ড্রাইভিং সীট থেকে রাস্তায় নামল রানা। এদিক ওদিক চাইল।

'ঘাবড়েই দিয়েছিলে একেবারে!' একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জামান। 'পুলিসের জীপ দেখে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল।'

'জলদি উঠে পড়ো জামান। ব্যাপার সিরিয়াস। আমার এতক্ষণে গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার কথা।'

উঠে পড়ল জামান পাশের সীটে। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'ব্যাপার কি বলো তো? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'নারিন্দা গোরস্থানে।'

'আমাকে সাথে নেবার কারণ?'

'দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, মারধোর খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি, কবর খোঁড়ার জন্যে একজন শক্তিশালী কর্মঠ সহকারী দরকার আমার। দ্বিতীয় কারণ, যখন কফিনটা খুলব তখন একজন সাক্ষী থাকা দরকার। একজন শক্তিশালী নির্বোধ লোক দরকার ছিল আমার—তোমার কথাই মনে পড়ল প্রথম।'

'কবর খুঁড়ে কফিন বের করে কি পাবে আশা করছ তুমি?'

'যা খুঁজছি।'

'আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি তো!'

'এখন আর পিছু হটবার উপায় নেই।'

গোরস্থানের গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি রাখল রানা। গাড়ির পিছন থেকে একটা কোদাল বের করে দিল জামানের হাতে। টর্চ নিল একটা। তারপর গেটের তালাটা পরীক্ষা করল। সাধারণ তালা। আধমিনিট খোঁচাখুঁচি করতেই খুলে গেল। ক্যাঁ···চ্ করে শব্দ হলো গেটটা ঠেলা দিতেই। গা-টা ছম ছম করে ওঠে এত রাতে এরকম শব্দ শুনলে। ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

গেটটা আবার বন্ধ করে রেখে রওনা হলো ওরা। সারি সারি বাঁধানো কবর। ক্রুশ। লম্বা লম্বা ঘাস। মাঝে মাঝে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ পাথরের মূর্তি। এক আধটা

শুকনো ফোয়ারা। হাজার হাজার কফিনের ভিতর হাজার হাজার নরকঙ্কাল চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পাথরে খোদাই করা নাম ধাম পরিচয়। সব অর্থহীন মনে হলো রানার কাছে।

প্রায় তিনশো গজ গিয়ে শেষ হয়ে গেল মানুষের কবর। খানিকটা ফাঁকা জায়গার পর একটা তার কাঁটার বেড়া। ছোট্ট একটা গেট। ওপাশে পেট-সেমিট্রি। সাহেবদের কাছে কুকুর বিড়ালের কদর ছিল কালা আদমির চেয়ে অনেক বেশি। ছোট ছোট অসংখ্য বাঁধানো কবর। এগিয়ে চলল ওরা। বেশ কিছুদূর এগিয়ে টর্চ ফেলল রানা খোদাই করা পাথরের গায়ে। ১৯৩৬ সাল। আরও এগোতে হবে। এগিয়ে গেল ওরা আরও পঞ্চাশ গজ।

পাওয়া গেল। নতুন কবর। কয়েকটা শুকনো ফুল পড়ে আছে। মার্বেল পাথরের গায়ে শুধু নাম আর মৃত্যুর তারিখ লেখা। একটা সজনে গাছের নিচে কবরটা। আশে পাশে ঘন ঝোপ ঝাড়।

'বসে পড়ো।' বলল রানা। 'আমি কিছুক্ষণ কুপিয়ে নিই, তারপর তোমার শিফট।'

'উহুঁ। বসব না। দুই পায়ে খাড়া থাকতে চাই আমি। যদি ওপাশ থেকে একটা কঙ্কাল উঠে আসে, মুহূর্তে যেন পাঁই পাঁই ছুটতে পারি।'

কথাটা বলার সাথে বিকট একটা কান্নার আওয়াজ এল, ওঁয়া ওঁয়া! থমকে গেল ওরা একমুহূর্তের জন্যে, তারপর হেসে উঠল দু'জন একসাথে। বট গাছের মাথায় শকুনের বাচ্চা কাঁদছে।

মাটি খুঁড়তে শুরু করল রানা। ফসকা মাটি। সহজেই উঠে আসছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফুট দুয়েক খুঁড়ে ফেলল সে, তারপর কোদালটা দিল জামানের হাতে, 'নাও। শুরু করো।'

টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলছে ওদের মধ্যে। বেশির ভাগ জামানই বলছে। বিশ মিনিটেই প্রায় বুক পর্যন্ত খুঁড়ে ফেলেছে সে। বলল, 'শালারা কয় হাত নিচে মাটি দিয়েছে আল্লাহ জানে।'

'তুমি একটু বিশ্রাম নাও। বাকিটা আমি খুঁড়ছি।' বলল রানা।

'এই-য়া! কি যেন ঠেকল কোদালের মুখে। টর্চটা জ্বালো দেখি?'

বেরিয়ে এল কফিনটা। আশ পাশ থেকে কিছুটা মাটি সরিয়ে হ্যান্ডেলটা ধরে টেনে তুলল ওটাকে জামান। কোদাল দিয়ে বার দুই টোকা দিল ঢাকনির উপর। 'খুলে যদি দেখা যায় কিচ্ছু নেই? নাও ধরো।'

দু'জন মিলে ধরে তুলে রাখল ওরা কফিনটা গর্তের পাশে। হাঁপাচ্ছে জামান। বলল, 'কবর চুরির কাজটা বড় খাটনির কাজ। বেতনটা বেশি না হলে কবে ছেড়ে দিতাম!'

'সরো, দেখি। খুলে ফেলি ডালাটা।'

ডালটা খুলতেই ভক্ করে বিচ্ছিরি একটা গন্ধ এল নাকে। চাঁদের আলো

পড়েছে অর্ধগলিত টমের মৃতদেহে। টর্চ জ্বেলে দেখল রানা টমের সারা শরীরে বিজ বিজ করছে দেড় ইঞ্চি লম্বা পোকা।

'ছ্যাঃ! গন্ধে টেকা যাচ্ছে না! কি ব্যাপার রানা? কি করতে চাও এখন মরা কুকুর নিয়ে?'

'কিচ্ছু না।'

'মাথাটা খারাপ নাকি তোমার? কুকুরটা মৃত—এছাড়া আর কি প্রমাণ হলো কবর খুঁড়ে?'

'প্রমাণ হলো যে ও একটা চোর ছিল।' সারা কফিন জুড়ে টমের খেলনা। নানান ধরনের। একটা রবারের ইঁদুর, একটা লোম উঠে যাওয়া টেনিস বল, একটা কালো গ্লোভ, এক পাটি স্যান্ডেল, ···আরও কত কি। একটা বড় সড় খেলনা ঘেঁটে বের করল রানা। তারপর কফিনের ডালাটা নামিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে চোরাই মাল।'

'এটা একটা খেলনা পিস্তল। কি প্রমাণ হলো তাতে?'

'এটাই ডক্টর রুহুল আমীনের সেই পিস্তল। এটা পাওয়া যায়নি বলেই মাহবুবের এই দুর্দশা।'

'তুমি বলতে চাও এই পিস্তলটার জন্যেই মারা গেছিল ডাক্তার? সামান্য একটা খেলনা···'

'সামান্য নয়। সামান্য বললে ভুল হবে।' পিস্তলের মুখ থেকে এঁটে লাগানো একটা কর্ক খুলে ফেলল রানা। সাবধানে পিস্তলের মুখটা ডান হাতের তালুতে ঠেকিয়ে যেন কিছু ঢালছে এমনি ভাবে বাম হাতটা উপরে তুলল। 'দেখো। নয়ন সার্থক করে নাও।' চিনির মত দেখতে অসংখ্য সাদা দানা ঝরে পড়ল রানার হাতের তালুতে। একটা দানা জিভে ঠেকিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

'চিনি মনে হচ্ছে?'

'এর আদি ও অকৃত্রিম নাম হেরোইন। এই জিনিসটুকুর দাম বিশ লক্ষ টাকা।'

## বারো

'হেরোইন!' তাজ্জব হয়ে গেল জামান। 'নেশা করত তাহলে ডাক্তার?'

'না নেশার জোগান দিত। নেশার চেয়েও ভয়ঙ্কর কাজ। সব রহস্যের সমাধান পাওয়া যাচ্ছে এখন। জুয়াড়ী মানুষ, সর্বস্ব খোয়াল জুয়ার টেবিলে, একটা বছর কষ্ট করল খুব, হঠাৎ কপাল ফিরে গেল তার তিন বছর আগে। ডাক্তার হিসেবে পসার নেই, কিন্তু টাকা আসছে বাঁধ ভাঙা বন্যার পানির মত। আলাউদ্দিনের চেরাগ পেয়ে গিয়েছিল যেন লোকটা।'

'খুব বড় লোকের ছেলে ছিল শুনেছিলাম?'

'ছিল। কিন্তু দশ বছর ধরে জুয়ার টেবিলে হেরে সব শেষ করেছে। হঠাৎ টাকা কোথায় পেল? খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি একেকজনের ধারণা একেক রকম। কেউ মনে করে দারুণ পসার ডাক্তারের, কেউ মনে করে শেয়ার মার্কেটে কপাল ফিরছে, কেউ মনে করে জুয়ার টেবিলে টাকা করেছে, কেউ মনে করে বাপের টাকায় এত টাকা। আসল কথাটা জেড এ্যান্ড জেড ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু তারা বলবে না আমাকে কিছুতেই।'

'আসল ব্যাপার টের পাওয়া গেল এতক্ষণে?' পিস্তলটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল জামান।

'আমি জানতাম তিরমিজ দ্বীপের সাথে নিশ্চয়ই কোন সম্পর্ক আছে। কিন্তু কি সম্পর্ক সেটা বুঝতে পারিনি। সেটা বুঝলাম আজ ডাক্তারের চেম্বারটা তছনছ হওয়ায়। চেম্বারের খেলনাগুলো ভাঙা হলো কেন ভাবতে গিয়েই বুঝে ফেললাম ব্যাপারটা।'

'ডক্টর রুহুল আমীনের মত একজন লোককে হেরোইন চোরাচালানী দলের নেতা হিসেবে ভাবা যায় না।'

'সে নেতা ছিল না। নারকোটিক ট্রাফিক বিরাট ব্যাপার। দলপতির বাস আমেরিকার লাস ভেগাসে। ওদের নেটওয়ার্ক আছে এখানে। তারাই বড়শিতে গেঁথেছিল ডাক্তারকে। ডাক্তারও দেখল ভাঙাচোরা আর্থিক অবস্থাটা অক্লেশে জোড়াতালি লাগাতে হলে এবং ধার শোধ করতে হলে এটা উত্তম পন্থা। কেউ সন্দেহ করবে না।'

'কিন্তু অ্যামেচারের উপর এতটা দায়িত্ব দিল ওরা? শুনেছিলাম...'

'সাধারণত দেয় না। কিন্তু দিতে বাধ্য হয়েছিল। তৎকালীন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চোখ ছিল ওদের উপর। একজন এজেন্ট বেশ কিছু দূর এগিয়েও গিয়েছিল। ভয় পেয়ে সমস্ত অপারেশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ওদের ছয় মাস। প্রায় আড়াই কোটি টাকার ব্যাপার। কাজেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিল ওরা। ওদেরই অনলস প্রচেষ্টায় মানবতার সেবক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ডাক্তার। কারও সন্দেহ করার কিছুই নেই। জংলীদের ভালবাসার দান গ্রহণ করত ডাক্তার। বেশির ভাগই আজেবাজে পুতুল ও খেলনা। কিন্তু প্রতিবারই এক আধটা খেলনা থাকত ওগুলোর মধ্যে যার দাম কমপক্ষে বিশ লক্ষ টাকা। বার্মা থেকে ঢুকে এই পথে চলে যেত হেরোইন গন্তব্যস্থলে।'

'বি...শ লাখ! তার মানে মাসে চল্লিশ লাখ! বছরে?'

'প্রায় পাঁচ কোটি। ডাক্তারের কমিশন যদি দুই পারসেন্টও ধরা যায় তাহলে দাঁড়ায় বছরে দশ লাখ।'

'ইশ্‌শ্‌! আমার মাথায় যে কেন এই বুদ্ধি এল না!' আক্ষেপ করল জামান।

'তোমার আমার কর্ম নয় ওটা। এজন্যে ডক্টর রুহুল আমীন, এম.বি.বি.এস,

এম.আর.সি.পি. দরকার। ওই রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠা দরকার।' হাসল রানা।

'হেরোইন আসার পর ওটা পাচার করতে হলেও সন্দেহের উর্ধ্বের কোন লোক দরকার। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ম বেঁধে চললেও যাকে সন্দেহ করা যায় না।'

'হ্যাঁ। ঢাকায় নিয়ে এল বুঝলাম! কিন্তু আমেরিকা পর্যন্ত পৌছত কি ভাবে?'

'হাতে হাতে। প্রত্যেক মাসের প্রথম ও তৃতীয় সোমবার জিনিসটা ঢাকায় এনে পৌছে দিয়েই ডাক্তারের কাজ শেষ।'

'তুমি বলতে চাও জেড এ্যান্ড জেড এর সাথে জড়িত? সেখানে ডেলিভারি দিত ডাক্তার হেরোইন?'

'জেড এ্যান্ড জেড যে জড়িত তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু মালটা সেখানে ডেলিভারি দিত না ডাক্তার। পারতপক্ষে জেড এ্যান্ড জেডের কাছে ভিড়ত না সে।'

'তাহলে?'

'সোমবার জিনিসটা নিয়ে এসে মঙ্গলবার তুলে দিত সে কারও হাতে। ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল শিডিউল। মঙ্গলবার কোথায় যেত ডাক্তার নিয়মিত? মিসেস জোনসকে দেখতে, তেরো নম্বর নিউ সার্কুলার রোডে।'

'মিসেস জোনস! অসম্ভব! আমাকে কেটে ফেললেও এ আমি বিশ্বাস করতে পারব না।' মাথা নাড়ল জামান।

'মিসেস জোনস হচ্ছে ছুতো। ডক্টর রুহুল আমীনই তাকে ওই বাড়িতে নিয়ে উঠিয়েছিল। এ কাজের একটা অসুবিধা, নিয়ম বাঁধা পুনরাবৃত্তি। এর ফলে মানুষের সন্দেহের উদ্রেক হয়। মানুষ জানতে চায়, ব্যাপার কি, এই লোকটা নিয়মিত এখানে আসছে কেন? তাই মিসেস জোনসের প্রয়োজন ছিল। আসল কাজটা সারা হত মিসেস জোনসের অলক্ষ্যে, ঢুকবার বা বেরোবার সময়। বারো, তেরো বা চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ির কোন একজন ভাড়াটে ঠিক সময় মত উপস্থিত থাকত। তার হাতে দিত ডাক্তার হেরোইন ভরা খেলনা।' হাসল রানা। 'আমার সহকারী যে সুন্দরী মেয়েটা দেখেছিলে, সোহানা চৌধুরী, একেবারে গর্দভ। মাথা ভর্তি গোবর। দারোগা জালাল শিকদার হচ্ছে আরেকটা। ডাক্তারকে কুমকুম হকের সাথে জড়িয়ে চুনকালি মেখেছে আমার মুখে। কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিকই ধরেছিল ওরা। মিসেস জোনসকে ক্যামোফ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করে অন্য কিছু করত ডাক্তার। ব্যাপারটা অনেক আগেই বুঝেছি আমি।'

'মনে হচ্ছে আরেকটা ভুল করতে যাচ্ছ।' বলল জামান চিন্তিত মুখে। 'বারো, তেরো বা চোদ্দ নম্বর ফ্ল্যাট বাড়িতে যদি ডাক্তারের কাছ থেকে হেরোইন বুঝে নেবার লোক বাস করবে তাহলে সাব-ইন্সপেক্টর যখন গুলি করল তখনও মালটা ডেলিভারি দেয়া হয়নি কেন?'

'সহজ উত্তর। জিনিসটা যার বুঝে নেয়ার কথা ছিল, সেই লোকটা বাড়ি ছিল

না। মিসেস জোনসের ওখানে বহুক্ষণ অপেক্ষা ক[illegible] শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল ডাক্তার হেরোইন সহ।'

'লেটার বক্সে রেখে গেলেই পারত?'

'বিশ লাখ টাকার জিনিস কেউ লেটার বক্সে রেখে চলে যেতে পারে না। হাতে হাতে পার করতে হবে জিনিসটা। কাজেই শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়ল ডাক্তার। মনে ভয়, কিছু গোলমাল হয়ে যায়নি তো! যেই গাড়ির কাছাকাছি গেছে, ওমনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পুলিসের লোক। দিশে হারিয়ে দৌড় দিয়েছে ডাক্তার। পুকুরের পাড়ে এসেই ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছে সে খেলনাটা। খেলনাটার আকৃতি নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিল ডাক্তার, কিংবা আশা করেছিল সে যখন ওটাকে খেলনা বলে জানে, তাড়া করে আসা পুলিসটাও ওটাকে খেলনাই মনে করবে। ওটা বের করতে দেখেই যে মাহবুব গুলি করবে তা ভাবতেও পারেনি বেচারা। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে যদি দৌড় না দিত, যদি সরাসরি মাহবুবকে জিজ্ঞেস করত, কি ব্যাপার? তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করে ছেড়ে দিত ওকে মাহবুব, কল্পনাও করতে পারত না যে বিশ লক্ষ টাকার হেরোইন আছে ডাক্তারের কাছে। ভয় পেয়েই গুলি খেল বেচারা।'

'পিস্তলটা পাওয়া যায়নি কেন?'

'রুস্তম আলী আর মাহবুব যখন ডাক্তারকে পানি থেকে তুলতে ব্যস্ত সেই সময় টম ওটাকে খুঁজে পায়। ডাক্তারের গন্ধ পায় ও পিস্তলটায়। ওর জন্যে মাঝে মাঝেই কিছু না কিছু খেলনা আনত ডাক্তার, সেদিন বিদায়ের সময় দেখা হয়নি ওর ডাক্তারের সাথে, ও মনে করেছে আসলে ওটা ওরই জন্যে আনা খেলনা। মধ্যে পিস্তলটা খোঁজেনি কেউ। সহজ কারণ। টমের খেলনাগুলোর মধ্যে পিস্তল খুঁজেছে সবাই। খেলনা পিস্তলের সম্ভাব্যতা আমার মাথায় এল এই কিছুক্ষণ আগে, যখন জানতে পারলাম যে ডাক্তারের চেম্বারটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কে যেন, পুতুলগুলো টুকরো টুকরো করেছে ভেঙে। শত্রু ও মিত্র দুই পক্ষই খুঁজছে একটা জিনিস, কিন্তু পাচ্ছে না। কোন্ জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে না? পিস্তল। ওটা কি খেলনা পিস্তল? সহজেই বুঝতে পারলাম, পিস্তলটা যদি খেলনা হয়ে থাকে, কোথায় পাওয়া যাবে ওটা।'

'ডাক্তারের চেম্বারে এই হেরোইনই খুঁজেছিল কেউ?'

'নিশ্চয়ই। নার্সটা হঠাৎ এসে পড়ায় তাকে ছুরি মেরেছে নির্মম ভাবে। কিন্তু এত করেও আসল জিনিস পায়নি সে। এদিকে হন্যে উঠেছে মাসুদ রানা। তিরমিজ দ্বীপ পর্যন্ত যেতে চাইছে। কাজেই ঠেকাও ওকে। ফাঁসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলো আমাকে, পুলিস যাতে গ্রেপ্তারে গাফিলতি না করে সেজন্যে সংবাদপত্রের রিপোর্টার ডাকা হলো। ওরা আশা করেছিল, আমাকে কয়েকদিন আটকে দিতে পারলেই মালটা উদ্ধার করে আপাতত কিছুদিনের জন্যে ঘাপটি মেরে থাকা যাবে।'

'অর্থাৎ এই খেলনাটা আবিষ্কার করে তুমি মাহবুবকে রক্ষা তো করলেই,

নিজেও বাঁচলে। তোমার কাজ শেষ।'

'উহুঁ। ওই লোকটা রয়ে গেছে। ডাক্তার যার হাতে হেরোইন তুলে দিত।'

'ওকে ধরা মুশকিল হবে। ধরে নিলাম লোকটা ওই বাড়ি তিনটের যে কোন একটায় থাকে। কিন্তু ওখানে তো বহু লোকই থাকে।'

'থাকে। কিন্তু সন্দেহের বৃত্তটা ছোট করে আনতে পারি আমরা সহজেই। সহজেই ধরে নেয়া যায় যে লোকটা মিসেস জোন্‌স যে বাড়িটায় থাকে, অর্থাৎ তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ি, সেখানেই থাকে।'

হালকা করে শিস দিল জামান। 'মিসেস জোন্‌সকে সন্দেহের বাইরে রাখা যায়, কুমকুম হকও তাই। তাহলে বাকি থাকে আরও সাতটি পরিবার। এ ছাড়াও আছে...'

'মতলব আলী। জেড এ্যান্ড জেডের নিয়োজিত ম্যানেজার।'

'ঠিক বলেছ। যদ্দূর মনে হচ্ছে ঠিক পথেই এগোচ্ছ তুমি। লোকটার চালচলন কেমন যেন সন্দেহজনক। বরাবরই দেখতে পারি না আমি ওকে।'

'দুঃখের বিষয় ওকেও সন্দেহের বাইরে রাখতে হচ্ছে।' বলল রানা। 'ডেলিভারি নেয়ার লোকটা অনুপস্থিত ছিল বলেই হেরোইন নিয়ে ফেরত যাচ্ছিল ডাক্তার। মতলব আলী সেই রাতে বাসায় ছিল। তেরো নম্বর ফ্ল্যাট বাড়ির প্রত্যেকটি বাসিন্দা বাসায় ছিল, কেবল তুমি ছাড়া। একমাত্র তুমিই সে রাতে বাসায় ছিলে না, জামান।'

# তেরো

খলখল করে হেসে উঠল জামান।

'বুঝতে পারছিলাম, বেহুদা গল্প শোনাচ্ছ না তুমি আমাকে। একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে তোমার। ঠিকই বলেছ, ঝড় বৃষ্টির জন্যে দমদম এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি সেদিন। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? ফাঁদ পেতেছিলে, তোমার ধারণা ফাঁদে পড়ে গেছি আমি। কি করতে হবে এখন আমাকে? হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করব?'

'হাতে পায়ে ধরার লোক তুমি নও জামান। তুমি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অতি-বিলাসী, স্বল্পবুদ্ধি ভয়ঙ্কর জানোয়ার।'

'পৃথিবীতে কোন্ লোকটা সবদিক থেকে ভাল?'

'কিন্তু তুমি যে সবদিক থেকেই খারাপ।'

'দুঃখের বিষয়, এর কোন প্রমাণ নেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল জামান। 'কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি। আমি সে রাতে বাড়ি ছিলাম না, তাতেই প্রমাণ হয়ে

গেল যে আমি হেরোইন ডেলিভারি নেয়ার সেই লোক?'

তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না আমি, জামান। কিন্তু পাইলট হিসেবে তোমার পক্ষে যে জিনিসটা ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে লন্ডনে উপযুক্ত লোকের হাতে তুলে দেয়া কতটা সহজ সেটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে। আজকে আমার বাসায় গিয়ে বাথরুমের বল্টু খুলে রেখে এসেছিলে তুমিই। তুমিই আমার ব্র্যান্ডির বোতলে বারবিচুরেটের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে এসেছিলে। তুমিই ফোন করে ইঙ্গিত দিয়েছিলে আমাকে, তুমি হুইস্কি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে, যেন আমিও কিছু একটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তুমিই পাঠিয়েছিলে আমাকে খুন করার জন্যে চারজন মৃত্যু দূত।'

'তার মানে আমি শুধু হেরোইন ক্যারিয়ারই নই, তোমার কল্পিত দস্যুদলের নেতা গোছেরও কিছু?'

'খসরুজ্জামান চৌধুরী তোমার বড় ভাই, একথা অস্বীকার করতে পারবে তুমি কামরুজ্জামান চৌধুরী? তোমাদের দুই ভাইয়ের কোম্পানী হচ্ছে জামান এ্যান্ড জামান অর্থাৎ জেড এ্যান্ড জেড—অস্বীকার করতে পারবে একথা?'

চুপ করে থাকল জামান কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এতেও কিছুই প্রমাণ হয় না, গোয়েন্দা সাহেব। তোমার ভাবটা হচ্ছে, একটা দিয়াশলাই পেলে আরাম করে একটা সিগারেট খাওয়া যেত—যদি সিগারেট থাকত। সবটা মিলে মস্ত বড় একটা লাড্ডু।'

'ডাক্তারের চেম্বারে দরজার নবে আমার ছাড়াও আরেকটা অপরিচিত আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। আমার বিশ্বাস তোমার ছাপের সাথে মিলে যাবে সেটা। কি করতে গিয়েছিলে তুমি ওখানে, পাইলট?'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল জামান। তারপর হেসে উঠল অপ্রকৃতিস্থের মত। 'পাক্কা হারামী লোক তুমি মাসুদ রানা। আমি দাদাকে সাবধান করেছিলাম, ভয়ানক ধূর্ত ওই টিকটিকিটা, কিছু আঁচ করার আগেই শেষ করে দাও। নাহ্, তিনি মনে করলেন তার চাইতে চতুর লোক থাকতেই পারে না দুনিয়ায়। তিনি কায়দা দেখাতে গেলেন।'

'আমি বুঝতে পারি আমাকে কেন খুন করতে চাও তোমরা। কিন্তু অলোকা? ওকে খুন করতে গেল কেন, জামান?'

'দোষ তোমার। তুমি ছয়টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছ তা জানব কি করে আমি? একটা মিথ্যা ইন্টারভিউয়ে ডেকে পাঠিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে হেরোইনের কনসাইনমেন্টটা খুঁজছি। ওটা খোয়াতে রাজী ছিলাম আমরা, কিন্তু যেভাবে পিছু লেগে গেছ তুমি, তোমার হাতে পড়লে অসুবিধা আছে, তাই খুঁজছি। এমন সময় এসে ঢুকল মেয়েটা চেম্বারে। উপায় ছিল না। দোষটা তোমার।'

'আমি যতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম ততক্ষণ তুমি ভিতরেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। মহা মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। জীবনে এমন ফাঁদে পড়িনি কোনদিন।'

'ভুল। এই মুহূর্তে তুমি সবচেয়ে বড় ফাঁদে পড়ে আছ।'

'সেটা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির উপর। অনেক দেরি করে ফেলেছ তুমি। আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার কাকে ডেকে আনছ এই গোরস্থানে কবর খুঁড়তে। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।'

'তুমি ভাবছ, বন্ধু ভেবে তোমাকে এখানে ডেকে এনে পিস্তলটা পাওয়ার পর আমি ভেবে বের করেছি যে তুমিই দোষী? ভুল, সবই ভুল। অনেক আগেই আমি জানি যে তুমিই সেই লোক। প্রমাণ ছিল না হাতে। পিস্তলটা খুঁজে না পেলে তোমার বিরুদ্ধে কিছুই হাজির করতে পারতাম না কোর্টে। তাছাড়া তোমাকে জ্যান্ত ধরতে চেয়েছিলাম আমি। তারজন্যে এরকম একটা নিরিবিলি ফাঁকা পরিবেশ দরকার ছিল।'

'তোমার ইচ্ছে পূরণ করতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। মানুষের বাঁচার তাগিদ বড় প্রবল।' এক লাফে উঠে দাঁড়াল জামান। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল একটা পিস্তল। 'বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে একটা ব্যাপার ভুলেই গিয়েছ তুমি মাসুদ রানা। তোমাকে হত্যা করার সব প্রচেষ্টা বিফল করে দিয়ে তুমি যখন কবর খোঁড়ার প্রস্তাব দিয়েছ, আমি এসেছি। এবং প্রস্তুত হয়েই এসেছি।'

'পিস্তল দেখিয়ে বাঁচতে পারবে না তুমি জামান।'

'শুধু দেখাবার জন্যে আনিনি এটাকে। ব্যবহার করব। কেউ টের পাবে না। কবর খোঁড়াই আছে। কুকুরের সাথে তুমিও ঘুমিয়ে থাকবে ওর ভিতর। প্রতিদিন ফুল দিয়ে যাবে মিসেস জোনস।'

'দেখো জামান, তোমাকে জ্যান্ত ধরতে চাই আমি। কিন্তু যদি তোমার বোকামিতে এখানে আজ কেউ মারা যায়, সেই ব্যক্তি হবে তুমি।'

'তোমার হাতের ওই খেলনা পিস্তলটা দিয়ে মারবে বুঝি?'

'না।'

'আমি জানি তুমি নিরস্ত্র।'

'হ্যাঁ, আমি নিরস্ত্র, কিন্তু আমার সঙ্গীরা কেউ নিরস্ত্র নয়। চেয়ে দেখো, তোমার ঠিক পাঁচ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে নির্বোধ সুন্দরী সোহানা চৌধুরী। তোমার ডান দিকের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে দারোগা জালাল শিকদার ও দুইজন সেপাই। তোমার বাম দিকের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে সাব-ইন্সপেক্টর রুস্তম আলী ও দুইজন সেপাই। সবাই সশস্ত্র। পিস্তলটা আর এক ইঞ্চি উঁচু করলেই গুলি খাবে তুমি জামান।'

থমকে গেল জামান। ঝট করে পিছন দিকে দেখল সোহানাকে। ডান দিকে ফিরল, সত্যিই ছয় হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। বাম দিকে ফিরল, সেখানেও তিনজন।

হঠাৎ পিস্তল তুলল জামান। 'তোকে শেষ করে তারপর মরব আমি শুয়োরের বাচ্চা।'

ঠা-ঠা-ঠা ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা! গোরস্থানের নিঝুম নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কফিনের মধ্যে চমকে উঠল বুঝি নরকঙ্কালগুলো। গর্জে উঠেছে রুস্তমের চায়নিজ স্টেন! ব্রাশ করেছে সে নিচে থেকে উপরে। একটা গুলি লাগল জামানের কব্জিতে। ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল। ঝাঁপিয়ে পড়ল জামান রানার উপর খালি হাতেই, ক্ষুধার্ত বাঘের মত।

প্রস্তুত ছিল রানা। মাথাটা সরিয়ে নিতেই ঘুসিটা পড়ল কাঁধের উপর। রানার ঘুসি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল জামানের, কিন্তু কিছু পরোয়া করছে না সে। শুয়ে পড়ল দু'জন মাটিতে। দুই হাতের কুনুই দিয়ে মেরে চলেছে জামান পাগলের মত। এগিয়ে এল সবাই, কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছে না। মাটিতে ছুটোপটি করছে দু'জন, একবার এ উপরে উঠছে, একবার ও। হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল জামানের দেহটা। বুকের কাছে দুই পা বাধিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে ওকে রানা। সোহানার মাথার তিন ফুট উপর দিয়ে বিশাল একটা বাদুড়ের মত উড়ে গেল জামানের দেহটা। ধপাস করে শব্দ হলো, যেন অনেক দূর থেকে। কেঁপে উঠল মাটি। কবরের ভিতর পড়েছে দেহটা।

সবাই এসে দাঁড়াল কবরের পাশে। নিশ্চিন্তে জ্ঞান হারিয়েছে পাইলট।

'ওয়েল ডান।' বলল জালাল শিকদার। সেপাইদের উদ্দেশে বলল, 'গাড়িতে তুলে ফেলো এটাকে। হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে রাখবে।' রানার হাত ধরল, 'আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই। আপনার সাহায্যের কথা ভুলব না আমি কোনদিন।'

'এই নিন আপনার সেই হারানো পিস্তল। সমস্ত কথাই নিজের কানে শুনেছেন, কাজেই ব্যাখ্যা করার কিছুই নেই। এখন আপনার কর্তব্য সারতে হবে আপনাকে দ্রুত। দেরি হয়ে গেলে বিগ ব্রাদার খসরুজ্জামানকে আর পাবেন না। রওনা হয়ে যান জলদি।'

গোরস্থানের সরু কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে চলল ওরা সারি বেঁধে।

একটু পিছিয়ে পড়ল রানা ও সোহানা।

'ক্লান্তি লাগছে বড়।' একটা হাত রাখল রানা সোহানার কাঁধে।

'আমার ভয় লাগছে।' রানার কোমর জড়িয়ে ধরল সোহানা।

'দেয়াল টপকে একা ঢুকেছিলে না তুমি গোরস্থানে?'

'হ্যাঁ।'

'এখন ভয় লাগছে কেন?'

'ভাবছি, কাজ ফুরোল। আবার হারিয়ে যাবে তুমি। এ কটা দিন বেশ কাটল একসাথে। তাই না?'

———